ভিন্ন চোখে সেলেব্রেটি কালচার
মিথের মাহাত্ম্য : অন্য আলোয় মিথের পুনর্পাঠ
ইমাম আহমদ রেযার মনোবিজ্ঞান তত্ত্ব
বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য

মাসিক সওগাত

রবিউল আউয়াল সংখ্যা, ১৪৪২

সূচী

কবিতা

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম : হাসান রোবায়েত
দোষটা তো তোমার না : মাহমুদ হাসান
মুখোশ : মুশফিক হাসান জামী
সত্য মিথ্যার তফাত : সাদিয়া জান্নাত
স্বপ্ন : আবদুল্লাহ ইবনে আলী

গদ্য

স্মৃতিবিলাস : জিনাতুননেছা জিনাত
ভিন্ন চোখে সেলেব্রেটি কালচার : শাহজাদা আল হাবীব
আবে যমযম : মইনুল কাদের

ভ্রমণকাহিনী

তামাশার শহরে দুইদিন : মো. রেজাউল করিম

প্রবন্ধ

মিথের মাহাত্ম্য : অন্য আলোয় মিথের পুনর্পাঠ : আহমেদ দীন রুমি
ইসলামী দৃষ্টিতে শিল্পকলা ও ঐতিহাসিক শিখার দৃষ্টিভঙ্গি : মুহাম্মদ আবু সাঈদ
ইমাম আহমদ রেযার মনোবিজ্ঞান তত্ত্ব : আসিফ খান
তাঁর আবির্ভাব : রাঈস আল জুহালা

গ্রন্থকথা

রহস্যের ব্যবচ্ছেদ অথবা হিরণ্ময় নীরবতা : জুবায়ের ইবনে কামাল

পছন্দের লিখাটি পড়তে
শিরোনামের উপর ক্লিক করুন

কালোত্তীর্ণ

বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য
আক্রমণের সহজ পন্থা
ভোট পাওয়া রাজনীতি

শ্রদ্ধা ও স্মরণ

অন্নদাশঙ্কর রায়
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত
মীর মশাররফ হোসেন
মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

মাসিক
সওগাত
রবিউল আউয়াল ১৪৪২ | আশ্বিন ১৪২৭ | নভেম্বর ২০২০

সম্পাদক
আসিফ উল আলম সৈকত
মোহাম্মদ আবু সাঈদ

প্রচ্ছদ
শেখ আ.ল.ম হুমাইর কায়সান

অঙ্গসজ্জা
সাঈদ মাহমুদ সোহরাব

মূল্য:
পাঠকের তৃপ্তির উপহার
বিকাশ: 01878-431312 (**পার্সোনাল**)

সম্পাদকীয়

যে কোনো পত্রিকার সংখ্যা- হোক সেটা সাধারণ- আর শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিমূলক হলে তো কথাই নেই- সংখ্যাটা 'রবিউল আউয়াল' হলেই পাঠকের আলাদা একটা চাহিদা, আবেদন এবং আকর্ষণ তৈরি হয়। শ্রেষ্ঠতম মানবসন্তানের আগমনী মাস হিসেবে তো স্বাভাবিকভাবেই সুস্থ, বিবেকসম্পন্ন মানুষের এই মাসের প্রতি একটা স্বতন্ত্র শ্রদ্ধাবোধ থাকে; আর উম্মত, প্রেমিক হলে তো বলার অপেক্ষা রাখে না। তো, পাঠকের আলাদা চাহিদা এবং আকর্ষণের কিছুই আমরা পূরণের চেষ্টা এ সংখ্যায় করিনি। কেউ যদি আমাদের প্রতি বিশেষ কিছুর পূর্ব-ধারণা রেখে থাকেন তাহলে তাঁর নিকট দুঃখ প্রকাশ করছি।

বৈচিত্র আনার জন্য এবার 'কবিতা'কে চৌকাঠে স্থাপন করা হলো। সময়ের বিশিষ্ট কবি হাসান রোবায়েতের কবিতাটি বাংলা সাহিত্যের না'তমূলক কবিতার ধারায় একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন- কবি কবিতাটি পুনঃপ্রকাশের অনুমতি দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞভাজন হয়েছেন। ***দোষটা তোমার না*** কবিতাটা সাময়িকভাবে হলেও, সময়ের স্রোতে ভেসে যাওয়া কচুরিপানা মনে হবে; আদতে তার শিল্পগুণে সময়কে অতিক্রম করার উপাদান আছে বলেই মনে করি। ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়া ***স্মৃতিবিলাস*** নামক স্মৃতিগদ্যের এই পর্বে পিতার প্রতি সন্তানের যে ঘোর লাগা আকুলতা প্রকাশ পেয়েছে তা যে কোনো সন্তান- বিশেষত বাবাহারা সন্তানকে আবেগে বিহ্বল করতে সক্ষম। ***ভিন্ন চোখে সেলেব্রেটি*** কালচার গদ্যে পাঠক নতুন কিছু চিন্তার খোরাক পাবেন। চিরকাল আদর্শ পাঠকদের মনহরণকারী বিষয়, মিথ নিয়ে প্রাবন্ধিক আহমেদ দীন রুমির প্রবন্ধটি সওগাতে প্রকাশিত এ-পর্যন্ত সকল প্রবন্ধের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এ সংখ্যায় স্মরণ করা হয়েছে চারজন সাহিত্যিককে- যারা এখনো প্রাসঙ্গিক এবং যাদের ব্যাপারে বিস্তর আলোচনা হওয়া দরকার।

কারিগরি যে কোনো অপ্রত্যাশিত ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত। লেখা সংগ্রহ, প্রুফ, সাজানো এবং প্রধান কাজ কারিগরি- যে কেউ যে কোনোভাবে সংশ্লিষ্ট- প্রত্যেকের প্রতি আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

হাসান রোবায়েত

এখানে কতদিন হিংসায়
গভীর ঢালুপারে নদীটির
জমেছে নীলাক্ষি কুয়াশায়
আমরা শুনি রাত মায়াবীর
আলো ও ছায়াময় নিয়রের
খেলেছে স্বেদবীজ সন্ধ্যায়
চোখের বুলবুলি উড়ে ফের
বসেছে মগডালে, নীলিমায়
ফলের ত্বকধোয়া আলো আর
ধানের দুধভরা রাত্রিতে
দিঘিতে কতদূর জোছনার
বাজছে বিউগল সরণীতে—
তবুও বালিহাঁস ঠোঁটে তার
রোদের সায়োনারা মারে ঝিম
পাথরে বাতাসের মাছরাঙা
নিভৃতে আকাশের নিচে দিন—
ডাকছি তোমাকেই, হৃদয়ের
রাহমাতাললিল আলামিন—
ফসল চক জুড়ে, বিকালের
আলোয় মুছে গেছে আয়ুরেখা
পাতাই পথ ছিল অন্ধের
ভূয়সী ইতিহাস, হাওয়ালেখা
ছুঁয়েছে সময়ের যোনিমুখ—
শস্য-উড্ডীন এই মাঠে
তারায় অশ্বেরা উন্মুখ

একাকী মহুয়ার আলো চাটে
সময় শুয়ে আছে যেন কুঁজ
যেন সে পাহাড়ের সানুতল
এ গান বিষণ্ন বহুভুজ
শরীরে ভাঙনের হাওয়াকল
এশিয়া বুদবুদ অনায়াসে
মজ্জা পচে গেছে বাতাসের
কণ্ঠে নীল হয় ইয়োরোপ
দুনিয়া এইখানে কী মলিন—
ভাঙছে শূন্যতা হৃদয়ের
রাহমাতাললিল আলামিন—
তুমি কি আসবে না এই খেতে
যেখানে বৃষ্টি ও পৃথিবীর
কাদায় শুয়ে মেঘ-সঙ্কেতে
মাটিতে ভিজে যায় আশরীর
বটের কষ ভরা এই বাঁক
যেখানে একা পাখি মরে যায়
যেখানে পানিকাউরের ঝাঁক
বিলের স্বেদ ফেলে হতাশায়
কোথাও ওড়ে ঘ্রাণ মৃত্যুর
ফাঁদের বিবমীষা, নোনা ঢাল
ভাবছে সে মরণ কতদূর
কোথায় সতীর্থ, সে বিকাল—!
তাদের তনুভরা কালো রঙ
হঠাৎ ছুড়ে দেয় ভরা চাঁদে

তুষার ঝরে যায় বাঙ্ময়ে
মহা সে সময়ের মেলানিন—
ডাকছে বহুকাল, হৃদয়ের
রাহমাতাললিল আলামিন—
অশোক-পাতাটির স্বেদ হিম
দুঠোঁটে মেখে নিয়ে সন্ধেরা
শনের আর্দ্রতা, ভেজে ডিম
ডানায় উড়ে আসে ঘরফেরা
যেন সে কিষানির কবুতর
রঙের ধনু হয়ে উড়ে যেত
সুগোল নেমে এসে তারপর
জীবন এইখানে সমবেত
তাদের কথা ভাসে হু হু রাতে
অতীতকাল সেই ঘননীল
কাঁপছে তিরতির আঙিনাতে
মেঘের আলো ঘেঁষে গাঙচিল
একদা গোধূলির নাইলনে
কোথাও ঝুলে আছে হারিকেন
টুপছে নিভু নিভু আলো তার
সূর্য ডুব যায় ধুলালীন—
ডাকছি দিনশেষে হৃদয়ের
রাহমাতাললিল আলামিন—
সাক্ষ্য গাঙপাড়ে কুঁজা গাছ
সাক্ষ্য ডাহুকের চোখা ঠোঁট
সাক্ষ্য শিশুদের গোল জিভে

মায়ের দুধ ভরা কালো বোঁট
সাক্ষ্য মাধুডাঙা নদীতীর
সাক্ষ্য সজনার ঋজু ফুল
সাক্ষ্য মায়াঢেউ শঙ্খের
মহররম মাসে দুলদুল
সাক্ষ্য দারুচিনি গাছটির
সাক্ষ্য চেলামাছ দওজোড়া
সাক্ষ্য হরিণের চরটিতে
একলা বেঁধে রাখা কাবু ঘোড়া—
কখনো মুদি সেই দোকানীর
পণ্য বেচবার ফাঁকে ফাঁকে
দেখার চোখ নিয়ে কী স্থির
ভালোও বেসেছিল হিংসাকে
অথবা গুল্মেরা দেবে ঋণ
হাওয়া ও মেশিনের ন্যুব্জতা
আকাশে ছড়িয়েছে সারাদিন
যেন এ কারাগার: সফলতা—
মৃতের পৌরুষ ভাবে চোখে
ব্যাকুল জাহাজির নৌপথ
ডুবছে সৈকতে, মীনলোকে
ভাসছে কতদূর দ্বৈরথ—!
ধাতুর শীত জুড়ে চলে যায়
নীরবে ট্রেনভরা হুইসেল
কাছিম শুয়ে আছে রোদপাশে
বাতাসে আলোছায়া কাঁপে ক্ষীণ—!
আত্মজীবনীতে এসো আজ
রাহমাতাললিল আলামিন—
যখন বনতলে দুটো চাঁদ
পাতার নদী ঝরে একাকিনী
বিষাদ এইখানে সারারাত

ছোট সে খাঁড়িটিও দুঃখিনী
স্রোতের মায়াঢেউয়ে মহিষেরা
রাতের ডুবোলীন জলাশয়ে
শুনছে দূরাগত অন্ধেরা
ঘোড়াকে ডেকে ওঠে সংশয়ে
তাদের খুর লেগে আলো ক্ষয়ে
হাওয়ায় পাক খায় সরলতা
আলোর যোনিমুখ সুর হয়ে
বেরিয়ে আসে গান, শূন্যতা—
দূরের খাঁড়িটিও বহমান
সাঁতারে আধোডোবা মহিষের
হাওয়ার অশ্রুতে কিশোরেরা
শুনছে অশরীরী কালো দিন—
তোমাকে ডাকে তারা, হৃদয়ের
রাহমাতাললিল আলামিন—
এখানে জীবনের বিবমিষা
খিন্ন আহ্লাদে কতদিন
শুনেছে নিখিলের বহু তৃষা
যুদ্ধ ভালোবেসে সীমাহীন
এশিয়া ইয়োরোপ আফ্রিকা
ব্যথায় ঘুমিয়েছে শূককীট
ফসলে মায়াবীর বিভীষিকা
সারাটা হাওয়া জুড়ে মর্বিড
মাথার খুলি ঘোরে সবিনয়ে
অন্ধকার এসে কত কাল
অক্ষিকোটরের ফুটা হয়ে
দেখছে চাঁদ সুইসাইডাল—
মৃত্যু টুপটাপ ঝরে যায়
অন্ধ এস্রাজে দিনমান

কোথাও বোধ নেই হাওয়াতেও
আলোর গন্ধতে কেরোসিন—
তোমাকে ডাকতেছে, হৃদয়ের
রাহমাতাললিল আলামিন—
আত্মহত্যার এইসব
অনেক আয়োজন এইখানে
সূর্যে হেঁটে গেছে হাওয়ামব
অপার হিলিয়াম সন্ধানে
ভাঙছে জুলকারনাইনের
সিসার তরলিত বিস্ময়
সময় ফুরিয়েছে দেয়ালের
উড়ছে শ্বাপদের কনভয়—
তবুও ফসলের সরণীতে
শান্ত পাকুড়ের ছায়াতীর
নদীর পাড়ঘেঁষা মসজিদে
তুমি সে নীরবতা মায়াবীর
কৃষির ঘাম চুয়ে শস্যতা
দুপুরে শিউলির ঝরা বুকে
ভাতের দানা ঘুম ফেলে গেছে
ঝাউয়ের বনানীতে যে কামিন—
তোমাকে ডাকে তারা, হৃদয়ের
রাহমাতাললিল আলামিন—
সাক্ষ্য শালিকের ফাটা ডিম
সাক্ষ্য জঙ ধরা এঁটো তালা
সাক্ষ্য কাপড়ের শত ভাঁজে
মায়ের তুলে রাখা হাতবালা
সাক্ষ্য দওপাড়ে বটগাছ
সাক্ষ্য মাতামহী, যত শ্লোক
সাক্ষ্য ঘাসবনে বেঁধে রাখা
গাভিন গরুটির দুই চোখ

সাক্ষ্য বাতাসের জোড়া মোষ
সাক্ষ্য আসরের মোনাজাত
সাক্ষ্য কবরের নিমফুলে
ছড়িয়ে থাকা মাটি, তৃণখাত
সাক্ষ্য দুবলার চরে কাশ
সাক্ষ্য বতুয়ার ঘন রঙ
সাক্ষ্য মসজিদে ঘড়িটির
পুরনো ঘন্টার ঢং ঢং
কিছুই ফেরে নাই, ভেসে যায়
নদীতে শালবন, নির্বাণ
প্রতিধ্বনিময় এ হাওয়ায়
নৌকা বয়ে যায় দিনমান
তাদের দেশ যেন নীলিমায়
তাদের দেশ যেন লুব্ধকে
নদীর ফেনাভূমি বৃথা যায়
অধ্যুষিত জলে কার শোকে
নৌকা যায় ভেসে একা একা
দরজা খুলে ধরে হাওয়ামন
পাথরে প্যাপিরাসে কাল-লেখা
হঠাৎ ভেসে ওঠে তুঁতবন—
কোথাও ঝুলে আছে সারা পথ
ময়লা রবিবার একা তারে
হেমন্তের স্বেদ ডুবে যায়
সুতার কৃষকেরা মাকুহীন—
সে মাঝি, তুঁতবন ডাকতেছে
রাহমাতাললিল আলামিন—
এ মাঠ বহুকাল দণ্ডিত
এ নদী বহুকাল শাপে লীন
এখানে চারু নিশিথিনী মৃত
গুল্মশাসিতেরা মনোহীন

মোহাম্মাদ প্রিয় দরদিয়া
মগজে হো হো হাসে লাল ট্রেন
আগুনে পোড়া জিভে ডাকে হিয়া
বাতাসে শুয়ে আছে অহিফেন
আমার চিরব্যথা আত্মায়
চূর্ণ ক্রমাগত গম্বুজ
সমুদ্রের মদে দিন যায়
নিখিল বিশ্ব কি মহাপুঁজ—!
মোহাম্মাদ প্রিয়, দরদিয়া
সাল্লু আলাইহি ওয়া আলিহি
আমাকে তুলে নাও মারী থেকে
প্রতিধ্বনি থেকে উড্ডীন—
দরুদ বর্ষিত হৃদয়ের
রাহমাতাললিল আলামিন—
কুয়াশাক্লান্ত এ ফ্যাসিবাদে
প্রেতের উড়ে যাওয়া সন্ধ্যায়
পালঙবনে কার পাখি কাঁদে
গোধূলি বেজে ছিল মনীষায়
ডিমের আধোভাঙা নীল সুর
বাতাসে, তৃণখেতে গোল হয়ে
পানির আলোছায়া যতদূর
সেখানে ঢেউলীন সংশয়ে
লাইট হাউজের ক্ষীণ আলো
পড়ছে রাত্রির ঘটনায়
হঠাৎ শুশুকের মিশকালো
শরীরে ডুবো চাঁদ মিশে যায়—
একটি মদ আসে ফেননিভ
সূর্য, বাতাসের মন্দিরে
ঝাউয়ের বন আর সৈকতে
রোদেরা কথা বলে ভূ-মুখিন

ডাকছে বালিয়াড়ি, ম্লান ঢেউ
রাহমাতাললিল আলামিন—
ভুবন চিলটির মিঠা ডাকে
সঘন হয়ে আসে এ দুপুর
তারার ঘ্রাণ ছুঁয়ে বিশাখাকে
বাজায় সারারাত সন্তুর
মৃতেরা কোনদিকে চলে যায়!
বনের সন্ধ্যায় থামে ঘোড়া—?
সূর্য-পারাপার নৌকায়
সে দেশ কতদূর, আনকোরা—!
সে দেশে বনেঘেরা তরমুজ
বাতাসে নীল মদ নহরের
উটের ক্রীড়াময় হাওয়া-কুঁজ
চলছে সারি সারি বণিকের
আমার আত্মা কি সেইসব
কুঁজের সঙ্কেত বঙ্কিম
পাহাড়ে আড়ালের ফাটা দাগে
বেগানা চাঁদ যেন প্যারাফিন
জ্বলছে বিস্ময়ে—হৃদয়ের
রাহমাতাললিল আলামিন—
কীর্ণ হয়ে আসে গোলাঘর
পরাঙ্মুখ রেলকলোনির
ছিন্ন টিকিটের মর্মর
আমরা শুনি নি কি ঝরা মিড়!
চন্দনের বনে রাজহাঁস
একলা ডেকে গেছে তনুমন
মিথুন-উদ্বাহু চারপাশ
উঠছে জেগে দূরে তুঁতবন
কাউকে মনে পড়ে দিনমান
শ্রাবণ-বৃষ্টিতে রেডিয়োয়

বাজছে সুরা আলে ইমরান
নিভৃত ঘুমিয়েছে মৃন্ময়
কাউকে মনে পড়ে এইখানে
অথবা দ্রুতগামী মর্মের
বিদায়গ্রস্ততা, অবসাদে
পাতার ঝরা পথে চিরদিন
মোহাম্মাদ, প্রিয় দরদিয়া
রাহমাতাললিল আলামিন

সাক্ষ্য দুপুরের মালিদও
সাক্ষ্য ঘুঘুভরা মেঠো তারা
সাক্ষ্য ভোরশীতে মায়ারোদ
নানির হাতে মাখা আস্বাদ
সাক্ষ্য কঞ্চিতে মাছরাঙা
সাক্ষ্য জেলেদের কালো গাও
সাক্ষ্য এক ডুবে ধরা মাছ
বাঁশের ফুলে ফোটা সন্ধ্যাও

সাক্ষ্য বেনেবউ পাখিটার
সাক্ষ্য হাতে বোনা ছোট ডালা
সাক্ষ্য বাতাসের রন্ধ্রতে
কাঁদছে হুসেনের কারবালা
সাক্ষ্য ভেড়াদের ঝুনঝুনি
সাক্ষ্য বন্ধুর কাছে ঋণ
মোহাম্মাদ, প্রিয় দরদিয়া
রাহমাতাললিল আলামিন—

উৎস: *এমন ঘনঘোর ফ্যাসিবাদে,* ঢাকাপ্রকাশ, ২০১৮ (২য় মুদ্রণ: ঐতিহ্য প্রকাশনী, ২০২০)

দোষটা তো তোমার না

মাহমুদ হাসান

বনিবনা নেই স্বামীর সাথে? অথবা স্বেচ্ছায়
অবৈধভাবে গেছ বিছানায়,
অতঃপর ব্রেকআপ?
ধর্ষণ বলে দাও। মামলা ঠুকে দাও।
জানো, তোমার দেশে ধর্ষণের সংজ্ঞা কী?
সুযোগ আছে, কেন লাগাবে না কাজে?
অন্যায় হবে?
বলি, কে সে তোমার যে তোমার সাথে ত্যাড়ামো করে?
সেও তার শাস্তি পেল, আর তুমি সহমর্মিতা।
হাজার হলেও তুমি যে ধর্ষিতা।

আরে চিন্তা কিসের?
দোষটা তো তোমার না। বরং যারা এ সুযোগটা করে দিছে।
বিয়ের আগেই বেটার হাফ হয়ে লুতুপুতু করো?
সমাজ একটু ট্যারা চোখে দেখলেও আইন তোমাকে সাপোর্ট দিবে।
হাগ করো, কিস করো
রাস্তায়, পার্কে যেখানে মন চায়।
লোকে কটু কথা বলবে?
বলি-
বিকৃত, আনস্মার্ট, বেয়াদব লোকগুলোর কি খেয়ে দেয়ে কাজ নেই?
তোমাকে নিয়ে নাক গলায়।
হা করে কে কি করে জানোয়ারের মত গেলে
আর তোমাকে জ্ঞান দেয়।
তারা কে,
তোমার চলন বলন নিয়ে কথা বলার?
সিদ্ধান্ত শুধুই তোমার তুমি কি করবে, কি পড়বে।

তাতে হোক না কিছু শরমের কমতি।
কি আসে যায় তাতে?
জীবন তো এটাই।
এখন না তো আর কখন?

তাতে যাক না তোমার বাবা মার মাথা কাটা।
লজ্জায়, অভিমানে সমাজ থেকে একটু থাকুক না দূরে।
পাশের বাসার আন্টি আর পড়শিদের তো কোন কাজ নেই?
খালি লোকের দোষ খুঁজে বেড়ানো আর নিন্দে মন্দ।
নিজেরা তো কিছু করতে পারে না,
কারো ভাল দেখতেও পারে না।

তাতে হোক না কিছু নিষ্পাপ শিশুর ডাস্টবিনে অবস্থান।
হোক না এবরশন।
সমাজ বলে তো কিছু আছে।
মুখটিও তো দেখাতে হবে, সমাজমাঝে।

এরপরও যদি কভু দুর্ভাগ্যবশত অনুশোচনা হয়,
নিজেকে অপরাধী ভাবার কোন কারণ নেই।
নিজেকে নিষ্পাপ মনে করার যথেষ্ট সুযোগ আছে।

কারণ,
দোষটা তো তোমার না। বরং যারা এ সুযোগটা করে দিছে।

মুখোশ

এস এম মুশফিক হাসান জামী

তুমি রক্তে মাংসের মানুষের অবয়বে
তুমি হিংস্র জানোয়ার তুল্য,
তুমি নগ্ন চিন্তার মস্তিষ্কের আবেশে
তুমি পারো না দিতে মানুষের মূল্য।

পশুত্বে ছেয়ে গেছে, আড়ালে মুখোশ
মনুষ্যত্ব বিসর্জনে হয় না কি আক্রোশ!
বিশ্বাসকে অবিশ্বাসে করো তোমরা নিকৃষ্ট
মুখোশের আড়ালে ছলনায় করো আকৃষ্ট।

মানুষ বলো কোন মুখে, কোন সে সভ্যতা
হও মানুষ তবে মনুষ্যত্বে, চেতনায় ভদ্রতা;
অবয়বে মানুষ নয়, ধারণ করো হৃদয়ে
ধুয়ে ফেলো সকল পাপ মনুষ্যত্বের সম্মার্জনে।

ফিরে এসো মানব খোদার তরে
নত হও, এসো হিংস্রতা ছেড়ে;
খোদা, তিনি সমাসীন আরশের চূড়ায়
পাবে খুঁজে সত্য, মানব মনুষ্যত্বের ছোঁয়ায়।

এইচএসসি পরীক্ষার্থী, সরকারি হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজ, চট্টগ্রাম।

সত্য মিথ্যার তফাত

সাদিয়া জান্নাত মুনমুন

সত্যগুলো আড়াল থাকে
মিথ্যে বালুচরে,
মিথ্যার যেনো দাপট বাড়ে
ছলচাতুরী করে।
সমাজ মাঝে সত্যগুলোর
লড়াই চলে নিত্য,
মিথ্যেগুলো লোকের মাঝে
হচ্ছে যে গোলবৃত্ত।
সত্যগুলো দেশে দশে
অবহেলায় সিক্ত,
নীতিবানে আদর্শেতে
নীরব ব্যাথায় রিক্ত।
টাকার কাছে সত্য-মিথ্যার
বেচা কেনা চলে,
লোভ লালসা মনে পুষে
ন্যায়ের কথা বলে।
সত্য-মিথ্যার তফাত মাঝে
চলছে সারাবিশ্ব,
দুর্নীতি আর প্রলোভনে
গরীবরা হয় নিঃস্ব।

স্বপ্ন

আবদুল্লাহ ইবনে আলী

স্বপ্ন দেখে, পৃথিবীর শতকোটি মানুষ,
ঐ যে এতিমখানার ছোট্ট মা হারা ছেলেটি,
সেও স্বপ্ন দেখে একদিন মা ফিরে আসবে।
যৌতুকের ভারে নুয়ে পড়া বৃদ্ধ বাবা স্বপ্ন দেখেন,
একদিন তার মেয়ের ঘর আলোকিত করে সুখ আসবে!
সদ্য গর্ভপাত হওয়া সেই অসহায় নারী স্বপ্ন দেখেন,
একদিন তার কোলে আসবে, এক ফুটফুটে শিশু।
বৃদ্ধাশ্রমে অশ্রু ঝরানো সেই বৃদ্ধ পিতা স্বপ্ন দেখেন,
দাদু ডাক ডাকতে ডাকতে ছুঁতে আসবে,
তার ছোট্ট পরীর মত নাতনীটা।
স্বপ্ন দেখে না খেতে পাওয়া সেই অন্ধ ছাত্র,
ব্রেইল বোর্ডে আঙ্গুলের ঘষায় একদিন সে,
মানুষের মত মানুষ হবে।
স্বপ্ন দেখে রাতভর অশ্রু ঝরাতে থাকা সেই প্রেয়সী,
একদিন তার ভালোবাসার মানুষটা ফিরে আসবে।
স্বপ্ন দেখে প্রবাসে ঘাম ঝরানো সেই পিতা,
তার কষ্টের উপার্জনে ছেলে মস্তবড় ডাক্তার হবে।
আমি কোনো এক বিবর্ণ পথিক স্বপ্ন দেখি,
একদিন বোধয় সবার স্বপ্নগুলো পূর্ণতা পাবে।

শিক্ষার্থী, সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ।

স্মৃতিবিলাস (পর্ব ৩)

জিনাতুননেছা জিনাত

ছোটবেলায় বাবা-মা আর নয় ভাই-বোনের একটা বিশাল পরিবার ছিল আমাদের। ছয় বোন, তিন ভাইয়ের মধ্যে আমি অষ্টম, বোনদের মধ্যে ছোট। অনেকটা বড় হয়ে জেনেছি, আমরা আসলে দশ ভাই-বোন ছিলাম, বড় ভাইটা জন্মের কয়েকমাসের মধ্যেই নাকি মারা গিয়েছিল। সবাই তার কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিল, এমনকি সংখ্যার হিসেবেও অস্তিত্ব ছিল না, কেবল মাঝেমাঝে প্রসঙ্গক্রমে মা তার কথা বলতেন।

বড় বোনদের কাছ থেকে জেনেছি, ছয়মাস বয়সে চিরতরে হারিয়ে যাওয়া ভাইয়ের নাম ছিল সাইফুল ইসলাম, তার আকিকা অনুষ্ঠানের ব্যাপক আয়োজন করা হয়েছিল বাড়িতে, দূর-দুরান্ত থেকে অনেক লোক এসেছিল সেই অনুষ্ঠানে, আগতদের মধ্যে একজনের নাকি টাইফয়েড ছিল। যদিও এটা কোন ছোঁয়াচে রোগ নয়, তবুও টাইফয়েড আক্রান্ত ব্যক্তির স্পর্শের মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়া স্থানান্তর হলে রোগটি অন্যদেরও হতে পারে। জানিনা কিভাবে কি হয়েছিল, তবে টাইফয়েড জ্বরে গুরুতর অসুস্থ হয়েই আমাদের বড় ভাই শিশু বয়সে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিল।

আব্বা-মা ঐ সময়টাতে আমাদের গ্রামের বাড়িতে (বাগেরহাট জেলার রামপাল উপজেলায় অবস্থিত হেদায়েতপুর গ্রামে) থাকতেন। শুনেছি ঐ ঘটনার পর দুঃখ-কষ্ট সইতে না পেরে আব্বা ছয়মাস গৃহ ত্যাগ করেছিলেন। সে বছর বি.এ. পরীক্ষাটাও আর দিতে পারলেন না তিনি। বাগেরহাট শহরের সন্নিকটে খানজাহান আলীর দরগাহ শরীফের পাশে অবস্থিত এক চাচার বাড়িতে অবস্থান করেছিলেন সেই সময়। প্রতিদিন ফজরের নামাজের পর থেকে কান্না শুরু করতেন তিনি, সারাক্ষণ মনের ব্যথায় কাতর হয়ে থাকতেন। একদিন খুব ভোরে খানজাহান আলীর দরগাহ শরীফের মিনারের উপরে উঠে আজান দিলেন নিজেই, তারপর কাঁদতে কাঁদতে আল্লাহকে বললেন, 'তোমার আমানত তুমি নিয়ে গেছ, আমি কেন এত কষ্ট পাচ্ছি?' এরপর থেকে না-কি আব্বার শরীরটা ধীরেধীরে হালকাবোধ করছিলেন এবং স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছিলেন।

মায়ের প্রকাশভঙ্গি অবশ্য ঠিক এর উল্টো ছিল। স্বাভাবিক নিয়মে সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব একা হাতে সামলে নিয়েছেন তিনি। যৌথ পরিবারে শাশুড়ি, দেবর, জা, তাদের সন্তান, সবার দিকেই খেয়াল রাখতে হতো মাকে, কারণ তিনি ছিলেন বাড়ির বড় বৌ। তখন আমাদের সবার বড় বোনটার বয়স মাত্র তিন বছর। তের বছর বয়সে বিয়ে হয়ে যাওয়া একটা কন্যা শিশু ষোল বছর বয়সে প্রথম মা হন, সবাই ভেবেছিল, আঠার বছরে প্রথম ছেলে সন্তানটিকে হারানোর ব্যথা তিনি কন্যা শিশুটিকে বুকে আগলে রেখে কিছুটা কমিয়ে ছিলেন হয়তো, কিন্তু না পঞ্চাশের দশকে জীবন থেকে হারিয়ে ফেলা শিশুটির ছোট ছোট কাঁথা-কাপড় তিনি অতিযত্নে সংগোপনে একটা ছোট মটকিতে মুখ আটকে রেখে দিয়েছিলেন নিজের কাছে, যেটা নব্বইয়ের

দশক পর্যন্ত আমাদের বাসায় ছিল! কোন পরিবর্তনের হাওয়া বা ঝড়-ঝাপটা মায়ের কোল থেকে তাকে উড়িয়ে নিতে পারেনি কখনও। নিজের ভেতর তোলপাড় করা সেই আবেগ তিনি কাউকে কখনও দেখাননি, কেবল একান্ত নিভৃতে জীবন্ত স্মৃতিটুকু আগলে রাখার নিরন্তর চেষ্টা করে গেছেন। ঊনষাট সালে আমার মেজো বোনের জন্ম হয়, একষট্টি সালে আমার মায়ের কোলে আসে আর একটি ছেলে, যাকে আমরা বড় ভাই বলে জেনে এসেছি চিরকাল। আব্বা আর ঝুঁকি নেননি, উনিশ'শ একষট্টি সালেই তিনি নিজের পরিবার নিয়ে গ্রাম থেকে বাগেরহাট শহরে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এরপর একে একে পৃথিবীতে আসেন সেজো আপা, মেজো ভাই, তারপর আমিসহ তিন বোনের আগমন। সর্বশেষ উনিশ'শ একাশি সালে কনিষ্ঠ ভাইটির জন্ম হয়। আমাদের বাড়িটিও ছিল চমৎকার, ভেতরে প্রবেশ করলে পুরোপুরি গ্রামের ছোঁয়া, বাইরে শহরের আবহ। সেখানেই মায়া মমতায় জড়াজড়ি করে কাটিয়েছি জীবনের প্রায় চব্বিশটি বছর। সেখানে না হয় সবাইকে আর একদিন নিয়ে যাবো...।

আমার আব্বা অতিমেধাবী কিন্তু অতিসাধারণ একজন ভালো মানুষ ছিলেন। জীবনে কোনো পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় হননি। লেখাপড়ার ক্ষেত্রে সবসময় প্রথম হয়েছেন, সেরাদের সেরা! তিনি তাঁর গ্রামের প্রথম গ্রাজুয়েট ছিলেন। শিক্ষাজীবনে তিনি মাদ্রাসা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী অর্জন করেছিলেন, সাথে বি.এড এবং এম.এডও করেছিলেন। বিভিন্ন সময়ে তাঁর স্বনামধন্য বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি হয়েছে, মদিনায় চাকরির জন্য চিঠি এসেছিল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েও একবার শিক্ষকতার সুযোগ হয়েছিল, সেসব চাকরি তিনি করেননি, তাঁর অজুহাত ছিল, 'এতগুলো ছেলে-মেয়ে রেখে দূরে গেলে কে ওদের দেখবে?' মনের পিছুটান আর প্রিয় স্যারের অনুরোধে স্থানীয় একটা বেসরকারী হাই স্কুলে (বর্তমান নাম বাগেরহাট কলেজিয়েট স্কুল) শিক্ষকতা শুরু করেন আব্বা। সেখানেই পেশা জীবনের বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছেন তিনি। ছোটবেলায় এসব কথা জানার পর আমি ভাবতাম- আব্বা কী খুব বোকা, না কি বুদ্ধিমান! হিসেব মিলতো না। তবে এতটুকু বুঝতাম, যে বাবা তার সন্তানদের থেকে দূরে না থাকার জন্য নিজেকে নিয়ে, নিজের ক্যারিয়ার নিয়ে এতটুকু ভাবেনি, সে বাবার স্থান নিঃসন্দেহে ভালো বাবাদের শীর্ষে।

আব্বার পেশা প্রসঙ্গে এত কথা লিখতে হলো এজন্য যে, তাঁর সততা, পেশার প্রতি আন্তরিকতা এসব ঠিক রাখতে গিয়ে আমাদের পরিবারে খুব একটা সচ্ছলতা ছিল না কখনোই। সারাক্ষণ অভাব অভিযোগ ছিল না ঠিকই কিন্তু এর পরোক্ষ প্রভাব পড়ত সবার লেখাপড়ার উপর। স্কুল জীবনের পড়াশুনা সবাই আব্বার স্কুলে শেষ করেছি, কলেজ পর্যায়ে গিয়ে সবার পড়াশুনার ব্যয়ভার বহন করা উনার জন্য ভীষণ কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। আমরা ভাই-বোনেরা অতিমেধাবী না হলেও মেধাবী ছিলাম। তাই বেশ কষ্ট করে হলেও সবাই পড়াশুনা শেষ করেছি। তিনি আমাদেরকে অনেক শক্তভাবে মানুষ করেছেন । সব সময় বলতেন: "সব কাজই মন দিয়ে করবে, আমি যেন বলতে পারি আমার ছেলে-মেয়েরা সব কাজ পারে"।

আট বছর বয়সে এতিম হয়ে যাওয়া একজন মানুষ কিভাবে শিক্ষা-দীক্ষায় স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছিলেন - আব্বার সেই সব বাস্তবতা আমাদের কাছে আজও শ্রেষ্ঠতম আদর্শ। ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়গুলো যেমন-নামাজ, রোজা ছাড়াও সত্য বলা, বিপদে মানুষকে সহযোগিতা করা, অন্যের দুঃখে ব্যথিত হওয়া প্রভৃতি নৈতিক শিক্ষাগুলো আব্বার কাছ থেকেই

পেয়েছি। তিনি খুবই ধর্মভীরু ছিলেন, তবে গোঁড়া নন। আধুনিক মন মানসিকতার ছিলেন এবং সেই বিষয়গুলো আমাদের মাঝেও সঞ্চারিত করেছেন। বাড়ির সামনে নারকেল গাছ ঘেরা একটা বিশাল পুকুরসহ প্রায় একবিঘা জায়গা ছিল আমাদের। সেটা দেখাশোনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল গনি মিয়াকে। কয়েক বছর পর আমরা জেনেছিলাম, গনি মিয়া কিভাবে যেন জায়গাটা জাল দলিল করে নিজের নামে লিখিয়ে নিয়েছে।

আব্বা খুব দুঃখ পেলেন কিন্তু ভেঙে পড়েননি! আমাদেরকে ডেকে সান্ত্বনা দিলেন, যেন নিজের মনটাকে শান্ত করার চেষ্টা করছিলেন! বুঝিয়ে বললেন: 'দিয়ে ধন, বুঝে মন, কেড়ে নিতে কতক্ষণ? তোমরা চিন্তা করো না, পরকালে ঐটুকুই আমাদের থাকবে।' কি অপরিসীম ধৈর্য ছিল তাঁর...

(চলবে)

সিনিয়র শিক্ষক, ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ।
প্রকাশিত গ্রন্থ: 'ক্যান্সারের সাথে যুদ্ধ : একজন জয়িতার গল্প' (আত্মজীবনীমূলক), এছাড়াও রয়েছে ২টি উপন্যাস, ২টি গল্পগ্রন্থ, একটি ধর্মীয় গ্রন্থ। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'তোমার মতো কেউ ভালো নয়

ভিন্ন চোখে 'সেলেব্রেটি কালচার' দর্শন

শাহজাদা আল হাবীব

প্রাচীনকালে মানুষকে বিনোদিত করার জন্য এক শ্রেণির মানুষ নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করতো। তাদের কেউ বিনোদন প্রদানকে পেশা হিসেবে বেছে নিতো স্বেচ্ছায়, আবার কেউ বেছে নিতো নানাবিধ পারিপার্শ্বিক কারণে, অনিচ্ছায়। কেউ মানুষকে বিনোদিত করতো বিভিন্ন ধরনের শারীরিক কসরত প্রদর্শন করে। যেমন: কুস্তি, লাঠিখেলা ইত্যাদির মাধ্যমে। আবার কেউ বিনোদিত করতো যাত্রাপালা, শাহী রাজ-দরবার কিংবা হেরেমে নেচে গেয়ে। লক্ষণীয় যে, একই ধরনের কাজ যাত্রাপালায় ও রাজসভায় করে বেড়াতো যে সকল নারীরা তাদের সামাজিকভাবে এক চোখে দেখা হতো না; স্থানের কারণে দেখা হতো ভিন্ন চোখে। অর্থনৈতিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে সম্মানের মাপকাঠিও পাল্টে যেতো অবলীলাক্রমে। ইতিহাসের পাতায় উল্লেখিত আম্রপালির মতো বিখ্যাত নর্তকী, প্রখ্যাত বাইজি ও বহু কুস্তিগীরের কাহিনি আজও মানুষকে আমোদ যোগায়।

হোমো সেপিয়েন্সরা যতই দিন দিন আধুনিক 'সভ্য মানুষ' হিসেবে গড়ে উঠছে, ততই বেড়ে চলেছে তাদের বিনোদনের চাহিদা। বিনোদনের চাহিদা বাড়ার কারণটা সম্পর্কে সমাজচিন্তকরা বেশ ভালোভাবেই অবহিত আছেন। **রাজ্যের হতাশা সৃষ্টিকারী পুরো পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটাই দাঁড়িয়ে আছে এর উপর ভিত্তি করে।** বর্তমান পৃথিবীর প্রবল বৈষম্যপূর্ণ আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা একদিকে যেমন তৈরি করে প্রবল আক্ষেপ, হতাশা, দুঃখ, দারিদ্র্য এবং সীমাহীন যৌন অবদমন এবং তেমনি অপরদিকে এর 'নিরাময়' হিসেবে সাময়িক সব যন্ত্রণা ভুলিয়ে দিয়ে 'বিনোদিত' করার জন্য দাঁড় করিয়ে রেখেছে হলিউড-বলিউড, স্পোর্টস-মিউজিক ও পর্নোগ্রাফির মতো বিলিয়ন ডলারের বিশাল বিশাল 'এন্টারটেইনমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি'গুলো। ইন্ডাস্ট্রির রক্ষাকবচরা নিয়ন্ত্রাধীন 'কর্পোরেট মিডিয়া' ব্যবহার করে নিজ খেয়ালখুশি-মতো এন্টারটেইনারদের মধ্যে থেকে বেছেবেছে 'স্টার', 'সেলিব্রেটি' এবং 'আইডল' বানিয়ে জনমানুষের সামনে 'অতিমানব' হিসেবে উপস্থাপন করে। এই সময়ে অবশ্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বদৌলতে মানুষ নিজে নিজেও 'সেলেব্রেটি' বনে যাওয়ার বিশেষ বিশেষ সব তরিকা আবিষ্কার করে ফেলেছে।

প্রাচীনকালে যেমন প্রতিষ্ঠিত ও বিখ্যাত 'এন্টারটেইনার' ছিলো, তেমনি এ-যুগেও তা বিদ্যমান রয়েছে; শুধু নাম-ধাম ও পদবী বদলে গেছে এবং একইসাথে আগাগোড়া বদলে গেছে বিনোদন প্রদানের মাধ্যমও। বর্তমানে পূর্বের মতো বিনোদনদাতাকে সশরীরে দর্শকের সামনে উপস্থিত হতে হয় না; আধুনিক স্যাটেলাইট-ইন্টারনেট কালচার বিনোদন জগতে এক অভূতপূর্ব বিপ্লব এনেছে। এটা জলের মতো পরিষ্কার যে, 'এন্টারটেইনার' বা 'সেলেব্রেটি' শ্রেণীর লোকেরা প্রাচীনকালে ছিলো, এ যুগেও আছে এবং মানুষের বিনোদনের চাহিদা যেহেতু একেবারেই শেষ হবার নয়, তাই আমজনতাকে বিনোদন প্রদানের জন্য বিনোদনদাতারা ও বিনোদন-মাধ্যম ভবিষ্যতেও অক্ষত অটুট থাকবে ও এর সার্বভৌমত্ব বজায় রাখবে।

হালের গ্লোবাল ভিলেজে সেলিব্রেটিরা যেনো পরিণত হয়েছে 'পাবলিক প্রোপার্টি'তে। তাদের ব্যক্তিগত জীবন বলে কিছু আর অবশিষ্ট নেই। বিনোদন সংবাদদাতাদের ধারণা, তাদের সবকিছুই সাধারণ মানুষ জানার জন্য উদগ্রীব হয়ে বসে

থাকে। ফলশ্রুতিতে বিনোদনের পাতায় কোন অভিনেত্রী একসাথে কয়টি আম খেলো, কোন অভিনেতার ছেলে কাকে বাবা ডাকলো, কোন তারকা সশব্দে বায়ুত্যাগ করলো; এসবের সবই গুরুত্বের সঙ্গে ঠাঁই পায় সংবাদমাধ্যমের বিনোদন পৃষ্ঠায়, অনলাইন পোর্টালের ফেসবুক পাতায়। ছলে বলে কৌশলে সেলিব্রেটিদের পরিণত করা হয়েছে একেকটি 'কাল্ট ফিগারে'। যার ফলে চেতন কিংবা অবচেতন মনে কোটি ভক্ত, ফ্যান-ফলোয়াররা তাদের মতো হতে চাইছে, তাদের পোশাক-আশাক, হেয়ার-স্টাইল অনুকরণ করছে; কেউ রীতিমতো সকাল দুপুর বন্দনাগীত গাইছে, পূজা অর্চনা করছে, কেউ বাণী চিরন্তন আওড়াচ্ছে, ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিচ্ছে। কেউ কেউ এও ভুলে গেছে যে, পূজিত দেবতাসম ব্যক্তিরা তাদের মতোই আহারাদি করে, প্রাকৃতিককাজে সাড়া দেয় এবং স্বাভাবিক মানুষের মতোই ভুল-ভ্রান্তি দ্বারা আচ্ছাদিত হয় ও ক্ষেত্রবিশেষে পাপও করে থাকে!

বহু প্রচারমুখী এ যুগের একজন 'এন্টারটেইনার', 'সেলিব্রেটি' কিংবা 'আইডলে'র শিক্ষিত-অশিক্ষিত-মূর্খসহ নানা ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি-পেশা ও বয়সের দর্শক-অনুসারী-গুণগ্রাহী বিদ্যমান। এদের মধ্যে সকলেই যে সকাল বিকাল সন্ধ্যা সেলিব্রেটিকে মাল্যদান করবে, তার ফেসবুক পোস্টে পুষ্পস্তবক অর্পণ করার ছবি কমেন্ট করবে, দিবানিশি শয়নে স্বপনে তার স্মরণে স্তুতিবাক্য গাইবে তা আশা করাটা সমীচীন তো নয়-ই বরং বড়সড় একটা বোকামি। লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে, বর্তমান সময়ে সেলিব্রেটি হবার অলিখিত সাংবিধানিক নিয়ম হচ্ছে, পর্যাপ্ত পরিমাণে 'হেটার্স' থাকা। নানা কারণে এইসব হেটার্স তৈরি হতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়, এক সেলিব্রেটির ফলোয়ার হলে আরেক সেলিব্রেটির হেটার্স হওয়া ফরজে-আইন। আধুনিক 'সভ্য ভার্চুয়াল' জগতে এ এক অদ্ভুত অলিখিত নিয়ম, অলঙ্ঘনীয় বিধি।

তো এইসব হেটার্সদের কাজ হচ্ছে বিরামবিহীনভাবে জলে-স্থলে, শহরে-মফস্বলে, গ্রামে-গঞ্জে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কমেন্টবক্সসহ সর্বত্রই অপছন্দের সেলিব্রেটির বিরুদ্ধে ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়ানো, খিস্তি-খেউড় উড়ানো ও ক্যাপিটালিস্ট নাগরিক জীবনে সঞ্চিত রাগ, ধীরে ধীরে পুঞ্জিভূত রাজ্যের ক্ষোভ-হতাশা হরহর করে বমি করে উগড়ে দেওয়া। কমেন্টবক্সে ঠিক কিভাবে কোন ভাষায় কোন বিশেষ তরীকায় তাদের ক্ষোভের সুপ্ত আগ্নেয়গিরির পুঞ্জিভূত লাভাটা উদগীরিত হবে তা অবশ্য নির্ভর করে ব্যক্তিটির শিক্ষাগত যোগ্যতা ও সামাজিক পদ-মর্যাদার উপর।

অনেক বন্ধুদের দেখি, সেলিব্রেটি এন্টারটেইনারদের কমেন্টবক্সে লোকজন কেনো গালি-গালাজ করে, মন্দ কুৎসিত বাজে কথা বলে এটা নিয়ে গালে হাত দিয়ে মন খারাপ করে বসে থাকতে, দুঃখী ব্যথিত কাতর হৃদয়ে জাতির বিবেকের কাছে প্রশ্ন রেখে স্ট্যাটাস দিতে। আমি অবশ্য এতে মন খারাপ করার কোনো কারণ খুঁজে পাই না। এসব সীমাহীন খিস্তিখেউড়, আজাইরা প্যাঁচাল, অতলান্তিক ফেতনা-ফ্যাসাদ এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করি। আইন করে মানুষকে কমেন্ট বন্ধ থেকে বিরত রাখা সম্ভব নয়। মানুষের মুখের উপর তো সবসময় বন্দুক ধরে বসে থাকা যায় না। সুপ্রাচীনকাল থেকে 'এন্টারটেইনাররা' জাগতিক টিককারি, অশ্লীল বচন, তীর্যকবাক্য সহ্য করে এসেছে। কিছু মানুষ তাদের ভালোবাসবে, সম্মান করবে; আবার কিছু মানুষ ঘৃণা করবে, তীব্র বাক্যবাণে বুকের পাঁজর জর্জরিত করবে, শব্দের আঘাতে জ্যান্ত কবরে পুঁতে ফেলবে এটাই স্বাভাবিক। এসবে তাদের মানিয়ে নিতে হয়। যারা মানিয়ে নিতে পারে না, সহ্য করতে জানে না, তাদের জন্য এই ঝকঝকে রূপালী ফাঁপা অন্তঃসারশূন্য সেলিব্রেটি জগত কিংবা গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ড নয়।

হলিউডের শ্রেষ্ঠতম সুন্দরী অভিনেত্রী ক্যাথরিন হেপবার্ন, যিনি প্রায় অর্ধশতাধিক চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন এবং কমপক্ষে এগারোবার অস্কার পুরষ্কারের জন্য মনোনীতা হয়ে চারবার পুরষ্কার লাভ করেন; চিন্তার অনেক খোরাক পাওয়া যায় যখন তিনি সন্দেহাতীত ভাষায় সদন্তঃকরণে বলেন, “I'm an actress which means I sell myself, my personality. I share myself, and that's a form of prostitution.” অর্থাৎ, “আমি অভিনেত্রী, তার মানে আমি আমার নিজকে, আমার ব্যক্তিত্বকে বিক্রি করি। আমি আমার নিজেকে প্রদান করি, আর তা হচ্ছে এক রকমের পতিতাবৃত্তি

জন্ম কিশোরগঞ্জ জেলায়,
বর্তমানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে অধ্যয়নরত।

আবে যমযম

মইনুল কাদের

উত্তপ্ত মরুরপথ। আশেপাশে নেই মানব। সামনে যতদূর চোখ যায় শুধু ধুধু মরুভূমি। মনে হচ্ছে যেন অনেক দূরে গিয়ে তা আকাশের সাথে হাত মিলিয়েছে। মাঝে মাঝে উঁচু ডিবি। বালি এতটাই উত্তপ্ত যে, পা রাখলেই ফোস্কা পড়ে যাবে। এই মরু অঞ্চলে উত্তপ্ততার একক সার্বভৌমত্ব। তাই পানির দেখা প্রায় মিলেই না। যে পানিগুলো রোদের থাবা থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে গভীর কূপে আশ্রয় নেয়, তৃষ্ণার্থ পথিকরা তাদের দিয়েই পিপাসা নিবারণ করেন।

আজ মুসলিম জাতির জনক এই মরুপথে চলছেন। সাথে আছেন ফেরেশতাকুল-সর্দার জিব্রাইল (আ.)। আরো আছেন, স্ত্রী হাজেরা (আ.) ও পুত্র ইসমাঈল (আ.)। সুদূর সিরিয়া থেকে তাঁদের এই যাত্রা। গন্তব্য (বর্তমান) মক্কার বাইতুল্লাহ। দৃঢ় পায়ে চলতে লাগলেন গন্তব্যে। অবশেষে পৌঁছলেন। নির্জন স্থান। কাঁটাযুক্ত বন আর বাবলা গাছ ছাড়া তেমন কিছু নেই। আল্লাহর আদেশেই আজ তাঁরা এখানে। আদেশটা কঠিন। এসেছে তো সবাই। কিন্তু ফিরে যাবেন কেবলই হযরত ইব্রাহিম (আ.)। স্ত্রী-সন্তানকে একা রেখেই চলে যেতে হবে তাঁকে। হযরত ইব্রাহিম (আ.) বহু কষ্টে এই কাজ করতে নিজেকে বোঝালেন। খোদার আদেশ আজ পর্যন্ত তিনি উপেক্ষা করেননি। প্রত্যেকটা পরিক্ষাতেই তিনি সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হয়েছেন। তাই তো মুসলিম বিশ্বে তিনি 'খলিলুল্লাহ'। আর আজকের এটাও একটা পরিক্ষা। অতএব, থলে ভর্তি কিছু খেজুর আর মশকে সামান্য পানি দিয়ে বিদায় নিলেন। হযরত হাজেরা (আ.) তাদেরকে এভাবে রেখে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে স্রেফ এতটুকুই বললেন, "এটি আল্লাহর আদেশ।" নবীপত্নী খোদার আদেশের কথা শুনে প্রভুর প্রতি তাওয়াক্কুলের সবটুকু প্রকাশ করলেন।

স্বামীর ওপর বিশ্বাস করে থেকে গেলেন। খোদার ওপর ভরসা করে কয়েকদিন কাটিয়ে দিলেন। কিন্তু সামান্য কিছু পানি আর খেজুরে কতদিন চলে? শেষ হয়ে যাওয়ায় সন্তানকে আর দুধ দিতে পারছেন না। মা আছে তবুও শিশু দুধের জন্য ছটফট করছে। হযরত হাজেরা আর সহ্য করতে পারলেন না। পানির সন্ধানে সাফায় আরোহন করলেন, দূর-দূরান্তেও কোন পানির দেখা মেলে না। সাফা থেকে নেমে মারওয়ায় গিয়ে থামলেন। সেখানেও নিরাশ হয়ে ফিরলেন।

ইতোমধ্যে সাত চক্কর হয়ে গেল। হঠাৎ, মারওয়ায় দাঁড়িয়ে আওয়াজ শুনতে পেলেন। ফিরে দেখলেন সেই ফেরেশতা যিনি আসার সময় সঙ্গী ছিলেন, হযরত জিবরাইল (আ.) এর পদাঘাতে মাটি হতে পানি উথলে পড়ছে। অসহায় মায়ের মুখে হাসির বসন্ত খেলে গেল। দৌঁড়ে নেমে এল পুত্রের পাশে। পানির গতি প্রচুর। কোন কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না। আনন্দে আত্মহারা হয়ে হযরত হাজেরা (আ.) বললেন, "যম যম।" জন্ম হল যমযমের।

যমযমের পানি অন্যান্য পানির চেয়ে আলাদা। স্বাদে এবং গুণে দুইভাবেই আলাদা। এর ওযন স্বাভাবিক পানির চেয়ে একচতুর্থাংশ বেশি। গবেষণায় দেখা গিয়েছে এতে এমন একপ্রকার উপাদান আছে যা ক্ষুধা নিবারক। বিশ্বপতি প্রিয়

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পানি পানের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি মদিনায় হিজরত করলে সেখানে এই পানি পাঠানোর নির্দেশ দেন। কেননা, এটি বিশুদ্ধ নিয়তে পান করলে রোগমুক্তি ও যাবতীয় আশা পূর্ণ হয়।

হযরত আবু যর (রা.) হতে বর্ণিত, রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যমযমের পানি বরকতময়, স্বাদ অন্বেষণকারীর খাদ্য ও রোগীর জন্য ঔষধ।" অন্যান্য পানি বসে খাওয়ার নির্দেশ থাকলেও এটি দাঁড়িয়ে পান করতে হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, "প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যমযমের পানি পান করেছেন দাঁড়িয়ে।" এই হল যমযমের পানির বিশেষত্ব। মহান প্রভু, আদি অন্তহীন স্রষ্টা আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহ আর বিস্ময় আবে যমযম।

শিক্ষার্থী, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্রাসা।

তামাশার শহরে দুইদিন (পর্ব দুই)

মো. রেজাউল করিম

সালাহউদ্দিন বয়সে আমার পনের বছরের ছোটো। কিন্তু বিদেশ-বিভূঁইয়ে বয়সের ব্যবধান যেন চুকে গেছে। তাই-ই হয়। কর্মস্থলের রাশভারী বসও ঢাকা থেকে বেরিয়ে যখন অন্য জেলামুখী হন তখন সহকর্মীদের সাথে চটুল আড্ডায় মেতে ওঠেন। হোটেলের বোর্ডাররা যে যার মতো একজনকে বগলদাবা করে ঘরে ঢুকছে। আমরা দুই বাংলাদেশি ব্যতিক্রম। রিসেপশনিস্ট নিশ্চয় তার সহকর্মীদের সাথে এ নিয়ে তামাশা করছে বা করবে। যে বিষয় নিয়ে সালাহউদ্দিনের সাথে ঘটা করে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করলাম তা হচ্ছে 'জাতিগত সম্পর্ক'। জাতিভেদের কারণেই পৃথিবীতে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে। জাতিগত দাঙ্গা হাঙ্গামাতে পৃথিবীতে কত কোটি মানুষ জীবন বিসর্জন দিয়েছে। অথচ যৌনতার ক্ষেত্রে মানুষ কেন ভিন্ন জাতের প্রতি আগ্রহী। ইউরোপিয়ানদেরকে এখানে রুশ রমণীদেরকে নিয়ে ঘুরতে দেখিনি। তাদের আকর্ষণ বাদামি চামড়ার থাই রমণী। পক্ষান্তরে ভারতীয়দের আকর্ষণ শ্বেত চামড়ার রুশ রমণীদের প্রতি। সালাহউদ্দিনের মৃদু হাসি আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারল না।

গাঁটের পয়সা উসুল করতে হবে। কাল একদিনের মধ্যে যতটা পারা যায় পাতাইয়া দেখে নিতে হবে। পরশুদিন বিকেল পর্যন্ত থাকব এ নগরীতে। রিসেপশন থেকে পাতাইয়া নগরীতে ভ্রমণের ব্রোসিয়র নিয়ে এসেছি। ব্রোসিয়র দেখেই পরিকল্পনা সাজালাম পরদিন। খুব সকালে সাগরের সৌন্দর্য অবলোকনে আমার দিল্ পরিষ্কার হয়ে যায়। সুতরাং ভোরে উঠে সাগর পাড়ে যাব। আটটার দিকে হোটেলে এসে গোসল, নাস্তা সেরে কোরাল রিফ বা প্রবাল দ্বীপপুঞ্জে ভ্রমণ। স্পিডবোটে যেতে হবে। দুপুর নাগাদ ফিরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম। বিকেলে আবার সাগর পাড়ে। সন্ধ্যায় ওয়াকিং স্ট্রিটে পদভ্রমণ। সংকোচ নিয়ে সালাহউদ্দিনের আবদার, 'ভাই আমাদের তো কোনো বদ উদ্দেশ্য নেই। রাতে রেডলাইট এলাকাতে একটু পদভ্রমণ করে দেখার খুব ইচ্ছে।' বেচারা তো পয়সা খরচ করে এসেছে। যা বলেছে তাতো মিথ্যে না। সম্মতি দিয়ে ঘুমোনোর আয়োজন করলাম। যত সমস্যাই থাকুক ঘরে মশককুলের সাড়াশব্দ পাইনি।

সে-রাতে নিদ্রাদেবী দ্রুতই ভর করল দুজনের ওপরে। সালাহউদ্দিনের বিছানা থেকে অবশ্য কিঞ্চিৎ নাসিকা গর্জনের শব্দ ভেসে আসছিল। মৃদু শব্দ বলাই ভালো, গর্জন বলা যাবে না। ক্লান্তিজনিত ঘুমের পথে তা বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। পরদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে বাথরুম-পর্ব সেরে দেশ থেকে নিয়ে যাওয়া বিস্কুট খেয়ে পড়িমরি করে সাগরসৈকতে ছুটলাম দুজনে। কিছুক্ষণ হেঁটে, নাকি ছুটেই পৌঁছলাম সৈকতে। তখন সকাল সাড়ে ছয়টা। রাতের বেলা সৈকত-সংলগ্ন পাহাড়ের গায়ে আলো ঝলমলে অসংখ্য বহুতল হোটেল ভবন দেখেছিলাম। কক্সবাজার সৈকতের পাশে যে ধরনের পাহাড় দেখা যায়, এ সৈকতের পাশে তার চেয়েও উঁচু সবুজ পাহাড়ের সারি। সাগরসৈকত এ জায়গাটাতে অর্ধচন্দ্রাকৃতির। সাগরের পানি এখানে পুরোই নীলাম্বরী। সদ্য উদিত সূর্যালোকের ছটায় সৈকতের বালুকারাশি চিকচিক করছে। ভোরে সূর্য যেন দ্রুতই পশ্চিমাকাশ পানে ধাবিত হয়।

উদীয়মান সূর্য থেকে বিচ্ছুরিত আলোকছটার নাচন সাগরসৈকতে এক অপূর্ব আলোছায়ার কায়া তৈরি করেছে।

যা ভেবেছিলাম তা না! ভেবেছিলাম সৈকত বুঝি-বা মানবশূন্য থাকবে কক্সবাজারে ভোরে যেমনটি দেখি। কিন্তু এখানে তা না। বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে এ শহরে আসে। অনেক পর্যটক এখানে আসে রাত জেগে আনন্দ-অভিসার করার জন্য। কিছু পর্যটক কিংবা কিছু দম্পতি মধুচন্দ্রিমাতেও এখানে আসে। সুতরাং কাকডাকা ভোরেও সৈকতে বেশ কিছু পর্যটকের আনাগোনা। আরাম চেয়ারগুলো ফাঁকা পড়ে রয়েছে। চেয়ারের ওপরের ছাতা গুটিয়ে রাখা হয়েছে। চেয়ারের মালিক কিংবা ইজারাদারের দেখা পেলাম না। পাশাপাশি দুটো চেয়ারে দুজন বসে পড়লাম।

যতদূর চোখ যায় দিগন্ত বিস্তৃত নীল জলরাশি। সাগর আর পাহাড় সর্বদাই আমাকে ডাকে। সে ডাক আর কেউ না শুনতে পেলেও আমি পাই। পাহাড়ের ডাকে সাড়া দেই। তার বুকে অবগাহন করি। কিন্তু সাগর আমাকে যেভাবে ডাকে তাতে আমি সাড়া দেই না। কেননা সে আমাকে যেভাবে ডাকে তা তার বুকে বিলীন হয়ে যাওয়ার আহ্বান। তা সম্ভব না। অপলক নেত্রে তার দিকে তাকিয়ে তার সৌন্দর্য, রূপ-মাধুর্য উপভোগ করি। সম্বিত ফিরে পাই সালাহউদ্দিনের ডাকে। 'ভাই প্রায় আটটা- চলেন হোটেলে। বিকেলে আবার আসব।' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই- এক যুবক পাশে এসে দাঁড়ালো। হাঁ চেয়ার ইজারাদারের টোল আদায়কারী! ক্যালকুলেটরের নব টিপে দেখিয়ে দিল দুজনকে দিতে হবে পঞ্চাশ বাথ (দু শ টাকা)।

হোটেলে যখন পৌঁছলাম তখন সোয়া আটটা। গোসল ও নাস্তা সেরে নিলাম দ্রুত। আবার বেরিয়ে পড়লাম ন'টায়। গন্তব্য প্রবাল দ্বীপ। কক্সবাজার, টেকনাফে ভ্রমণে গিয়ে প্রবাল দ্বীপ সেন্ট মার্টিনে না গেলে ভ্রমণ অসমাপ্ত থেকে যায়। তেমনি পাতাইয়া এসে কোহ লারন-এ না গেলেও ভ্রমণটা অসমাপ্তই থেকে যাবে। টুকটুকে করে দশ মিনিটেই ঘাটে পৌঁছে গেলাম। ঘাটে এসে দেখলাম স্পিডবোট ছাড়াও প্রবাল দ্বীপে ছোটো জাহাজ যাতায়াত করে। প্রথম জাহাজ ছাড়ে ন'টায়, ওদিক থেকে শেষ জাহাজ ছাড়ে বিকেল ৫টায়। ঘাটে পৌঁছে চক্ষু যেন চড়কগাছ। শত শত স্পিডবোট এবং ডজনের ওপরে ছোটো যাত্রীবাহী ফেরিজাহাজ। স্পিডবোটে সময় লাগে ৩০ মিনিট। ফেরি জাহাজে এক ঘণ্টা। ঘাট অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। হাঁক-ডাক নেই। ত্রিশ বাথ (এক শ বিশ টাকা) দিয়ে টিকেট করে একটা ফেরিজাহাজে উঠে বসলাম। খুব শক্তপোক্ত জাহাজ বলেই মনে হলো। সকলেরই বসার ব্যবস্থা আছে। রসুইঘরও আছে। জীবনরক্ষাকারী সরঞ্জামের কোনো ঘাটতি নেই।

জাহাজ ছেড়ে দিল। দ্রুতগামী জাহাজ সাগরের বুক চিড়ে এগিয়ে চলল প্রবাল দ্বীপ 'কোহ লারন' অভিমুখে। পাশ দিয়ে প্রবাল ঢেউ তুলে আরও দ্রুত গতিতে ছুটে যাচ্ছে অসংখ্য স্পিডবোট। আধা ঘণ্টা পার হয়েছে। তখন পাতাইয়া নগরী দৃশ্যপট থেকে অপসৃত হয়েছে। কোহ লারনও দেখা যাচ্ছে না। বিশাল নীল জলরাশির মধ্যে ছোটো এক জাহাজে আমরা আকাশের গাঙচিলগুলো যেন তখন আমাদের একমাত্র সঙ্গী। আরও কিছুক্ষণ পরে দূরে সবুজের আভা দেখতে পেলাম- কোহ লারন প্রবাল দ্বীপ। কোহ লারন জাহাজ ঘাট খুব পরিচ্ছন্ন। স্পিডবোট ভিড়ার ঘাট পৃথক। জাহাজ থেকে নেমে মিনিট দশেক প্রধান সড়ক ধরে ইতস্তত হাঁটলাম। কাল রাতেই হোটেল থেকে পাওয়া ব্রোসিয়রে এ দ্বীপের বিনোদনের উপায়-উপকরণ জেনেছি। জাহাজেও ব্রোসিয়র পেয়েছি। কিছুটা হেঁটেই বিস্মিত-বিহ্বল-বিমূঢ় হয়ে পড়লাম। মন ছুঁয়ে গেল দেশের কথা- কক্সবাজারে একটা শিশুপার্ক নেই। প্রধান সড়কের দুপাশে পাকা ফুটপাত পর্যন্ত নেই।

খোলা পানির সাগর পাড়ে বড়রা আনন্দ পেলেও শিশুদের আনন্দের জন্য কোনো ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়নি। একটা বাস টার্মিনাল পর্যন্ত নেই।

এখানে সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা। পৃথিবীতে এমন কোনো অ্যাডভেঞ্চার উপকরণ বোধ হয় নেই যা এ দ্বীপে দুষ্প্রাপ্য। সার্ফিং স্নোরকেলিং, ওয়াটার স্কিয়িং, প্যারা গ্লাইডিং- কী নেই এখানে! সব উপকরণ মজুত করা হয়েছে এ দ্বীপে। তাই তো সারা বিশ্ব থেকে এত এত মানুষের আগমন এখানে। নানা দেশি রেস্তরাঁর সমাহার রাস্তার দুধারে। দ্বীপের সাগর পাড় ঘেঁষে সৈকতে খোলা আকাশের নিচে রেস্তরাঁগুলো বেশ জমজমাট মনে হলো। টেবিলের ওপরে অবশ্য বিশালাকৃতির রঙিন ছাতা। এখানে অ্যাডভেঞ্চারিজমের যেসব উপকরণ তা দেখা ছাড়া কোনোটিতেই আমার আগ্রহ নেই। তবে সালাহউদ্দিন প্যারা গ্লাইডিং করতে চায়। বয়সে তরুণ- আমার মতো ভীতুও নয় সে। গ্যাস সিলিন্ডারযুক্ত বিশাল বেলুনে নিজেকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে শূন্যে উঠে গেল। ওগুলো পঞ্চাশ, খুব বেশি হলে ষাট ফুট (ছ'তলা ভবনের সমান) উচ্চতায় উঠতে পারে। নির্ধারিত সময়ের আগেই ও নেমে এল। দুই পায়ে গ্যাসসিলিন্ডার বেঁধে বেলুন ছাড়াই ওড়ার ব্যবস্থাও রয়েছে। কিছু দুঃসাহসী শ্বেতাঙ্গ ওগুলোর গ্রাহক হয়ে স্থলভাগ পেরিয়ে রীতিমতো সাগরের ওপরেও আকাশ ভ্রমণ করছে।

ঘণ্টা খানেক হেঁটে কোলাহল ছেড়ে সাগর পাড়ে পাথরের দেখা পেলাম। এখানে পানির গভীরতা খুব কম। পানির নিচে জলজ উদ্ভিদের কারণেই সম্ভবত পানির রঙ এখানে সবুজ। মাত্র তিন-চার ফুট গভীরতায় জলজ উদ্ভিদের গা ঘেঁষে নানা বর্ণের মাছ ছোটাছুটি করছে। খোলা আকাশ (ওপেন স্কাই) রেস্তরাঁতেই আগাম মধ্যাহ্নভোজ সেরে নিলাম। ক'দিন দক্ষিণ ভারতীয় খাবার খেয়ে ক্লান্ত। স্প্যানিশ রেস্টুরেন্টে খেলাম- স্প্যানিশ স্টাইল স্প্যাগেটি আর ফ্রাইড লবস্টার। উইদাউট মিট বলায় খিদমতগার ম্যানেজারকে ডেকে আনল। স্প্যানিশ মহিলা আমাদের নানাভাবে বোঝালো কিছু মাংসের টুকরা না দিলে সুস্বাদু হবে না। বেশ কোশেশ করেই তাকে রাজি করালাম এটা বলে যে আমরা নিরামিষাশী। নিরামিষ স্প্যাগেটি বোধ হয় এখানকার শেফ কোনোদিন তৈরি করেনি। যে কারণে এবারে ম্যানেজারের সাথে তিনিও আমাদের দরবারে তশরিফ আনলেন। তিনি জিগ্যেস করলেন পনির, ডিম বেশি করে দেয়া যাবে কিনা। হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লাম। বলতে দ্বিধা নেই, নিরামিশ স্প্যাগেটি ছিল সুস্বাদু। পুরোটা খেয়েছিলাম- একেবারে যাকে বলে চেটেপুটে খাওয়া। পাতাইয়া হোটেলে যখন এসে পৌঁছলাম তখন বিকেল চারটা। বিশ্রামের সময় নেই। খুব ভোরে উঠেছি। একটা ভাত ঘুম দেয়ার ইচ্ছে ছিল। সময় হবে না। আবারও গোসল করে ঝাড়া পনের মিনিট 'শবাসন' যোগব্যায়ামটি করলাম। শরীর মন সম্পূর্ণ সতেজ হয়ে উঠল। ক্লান্ত শরীরে এই আসনে যোগব্যায়ামের সমস্যা হচ্ছে ঘুম এসে যেতে পারে। সালাহউদ্দিন ঘুমিয়েই পড়েছে। বেচারাকে ডেকে তুলে নতুন কাপড় চোপড় পাল্টে নিলাম। হোটেলে রেস্তরাঁ নেই। তবে রিসেপশনে কফি মেশিন আছে। ব্যাগ থেকে দেশি বিস্কুট বের করে খেয়ে কফি মেশিন থেকে দুজন দু'মগ কফি কিনে খেলাম। সকালের রিসেপশনিস্ট তখনও আছে। হালকা হাসি দিয়ে জিগ্যেস করল কোথায় কোথায় বেড়ালাম, এখন কোথায় যাব। বললাম, ভোরে সাগরসৈকত দেখে কোহ লারন দ্বীপে গিয়েছিলাম। কাল ওয়াকিং স্ট্রিট ঘুরে দেখেছি, আজ আবার যাব।

'কোহ লারন থেকে এত তাড়াতাড়ি চলে আসতে পারলে?'

'হ্যাঁ, আমাদের সময় কম তো। অফিসের কাজে ব্যাংকক এসেছিলাম। দু'দিন অতিরিক্ত ছুটি নিয়ে পাতাইয়া এসেছি।'

‘এখন কোথায় যাবে?’ ‘এখন আর একবার সৈকতে যাব। বিকেলের ভিড়ে সৈকত থেকে সূর্যাস্তটা দেখব।’

‘সৈকতে এক্সক্লুসিভ জোন আছে, তা জানো।’ ‘মানে?’ ‘ওটা বিদেশিদের জন্য। ওখানে মূলত প্রকৃতিবাদীরা যায়।’

‘তার মানে ওটা নিশ্চয় নুড বিচ?’

‘হাঁ।’

হায়! মানবসভ্যতার ইতিহাসে পড়েছি আদিমযুগে গুহা মানবরাও গাছের ছাল-পাতা দিয়ে লজ্জা নিবারণ করত। জ্ঞানের বিকাশলাভের প্রথম পর্যায়েই মানুষ শিকারলব্ধ মাছ-মাংস পুড়িয়ে খাওয়ার অভ্যাসে পরিবর্তন আনে, তারা রান্না করতে শেখে। এরপরেই তারা পাথরে পাথর ঘষে ধারাল অস্ত্র তৈরি করে। ওগুলো দিয়ে পশু শিকার, জমিকর্ষণ ইত্যাদি কাজ করতে থাকে। এরপরেই তারা কাপড় চোপড় পরার তাগিদ অনুভব করে। তারা তৈরি করে বয়নযন্ত্র, তৈরি করে কাপড়। এই ইলেকট্রনিক যন্ত্র-সভ্যতার যুগে কিনা প্রকৃতিবাদ! ঐ লোকগুলোকে মানসিকভাবে অসুস্থ বলেই আমার মনে হয়। গোটা দিন সপরিবারে কাপড়বিহীন অবস্থায় সাগরসৈকতে শুয়ে বসে থাকবে। সেখান থেকে ফিরে উচ্চমাত্রায় ক্ষতিকর সিএফসি গ্যাস নির্গমনকারী যন্ত্র ফ্রিজ থেকে সর্বাগ্রে হুইস্কি বের করে খাবে। এরপরে আরও এক উচ্চমাত্রার সিএফসি গ্যাস নির্গমনকারী শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে শয়ন করবে। তখন প্রকৃতির কথা ভুলে যাবে।

‘না আমরা ওখানে যাব না।’

‘তোমরা মুসলিম?’

‘হাঁ, কেন?’

‘মুসলিমদের বেশিরভাগই রক্ষণশীল। আমি আগে ব্যাংকক থাকতাম। ওখানে মুসলিম মেয়েদের দোকানদারি করতে দেখেছি। সবসময় হিজাব পরে থাকে। নিবন্ধন খাতায় দেখলাম তোমাদের ঘরে কাল কোনো নারী-অতিথি আসেনি, আজ আসবে?’

‘না, আজ না, কালও না।’

‘ও তোমরাও তো খুব রক্ষণশীল। তাহলে পাতাইয়া এসেছো কেন?’

‘দেখতে। এই যেমন আজ কোহ লারন দ্বীপের সৌন্দর্য দেখলাম।’

‘রেড লাইট এলাকায় যাবে না? ঘুরে দেখতে পার।’

‘হাঁ দেখতে যাব। আচ্ছা বলতো ওখানে গেলে কেউ আমাদের ধরে টানাটানি করবে না-তো?’

‘অসম্ভব! তোমার দিকে তাকিয়ে হাসবে। ডাকও দিতে পারে। কিন্তু টানাটানি করবে না। নিশ্চিন্তে যেতে পার।’

মগে কফি শেষ, সময়ও স্বল্প, একেবারে চলতি ভাষায় যাকে বলে টাইট। ধন্যবাদ জানিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে দশ মিনিট হেঁটে সাগরসৈকতে চলে এলাম। এলাহী কাণ্ড! দৃষ্টি প্রসারিত করলেই মনে হয় ইউরোপের কোনো সাগরসৈকত। নারী-পুরুষে ঠাসা। আমাদের কলাতলী সৈকতের মতো। জনবহুলতা ছাড়া আর কোনো সাদৃশ্য খুঁজতে যাওয়া নিরেট বোকামি। নারী-পুরুষ সকলেই স্বল্পবসনা। তবে নারীদের পোশাকের দৈর্ঘ্যজনিত স্বল্পতা অবর্ণনীয়। আমার মতো অনেকেরই এ সৈকতে সন্তানাদি নিয়ে আসা সম্ভব নয়। সৈকতে চাদর বিছিয়ে শোয়া মেয়েগুলো জেগে না ঘুমে বোঝা যায় না। গোটা শরীর উদোম করে রাখলেও চোখে কালো কাপড় বেঁধে রেখেছে আলো যেন ওদেরকে বিরক্ত না করে। ওরা চামড়া ট্যান করছে। বাংলাতে বললে যা দাঁড়ায় তা হচ্ছে, সাদা চামড়া রোদে পুড়িয়ে বাদামি করার চেষ্টা করে। হায়! বাদামি চামড়ার ঔজ্জ্বল্য বাড়ানোর জন্য ফেয়ার অ্যান্ড লাভলির বিজ্ঞাপন আমাদের দেশে কতই না রমরমা। কেউ-ই কী তাহলে নিজ অবস্থানে সুখী বোধ করে না?

অসংখ্য মানুষ কিলবিল করে হেঁটে বেড়াচ্ছে। একেবারে ঢাকায় মিরপুর ৬ নম্বর বাজারে শুক্রবার সকালে যেমনটি হয় আর কী! এরই মধ্যে নারী কিংবা পুরুষ চাদর বিছিয়ে ম্যাসাজ

নিচ্ছে। ম্যাসাজের ধরন দেখে মনে হয় একেবারে শরীর দলাই-মলাই যাকে বলে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ম্যাসাজ গ্রহীতা বিপরীত লিঙ্গের কাউকে বেছে নিয়েছেন। সৈকতের ভিড় ঠেলে সাগরের নীল জলের কিনারায় দাঁড়ালাম। পশ্চিমাকাশে সূর্য তখন আজকের মতো বিদায় নেবার পালায় নিমগ্ন। প্রবল তেজে গোটা দিন এই ধরাধাম আলোকিত করার পরে প্রস্থান-পর্বে লজ্জাবশত রক্তিম আভা ধারণ করে সকলকে বিদায় জানাচ্ছে যেন। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে ঘন কালো মেঘের আভায় তার রক্তিমাভাও লুপ্তপ্রায়। তখনও সাগরে কিছু মানুষ ব্যস্ত গোসল, সার্ফিং কিংবা জেট বাইক নিয়ে।

এদেশ তো নেপাল, ভুটান কিংবা মিয়ানমার নয় যে রেস্তরাঁ রাত আটটায় বন্ধ হয়ে যাবে? সুতরাং সিদ্ধান্ত হলো আজ দেরীতেই রাতের খাবার খাব। যাকে বলে লেড ডিনার। ভেতো বাঙালি বলে বদনাম আমাদের। কেন, কে, বা কারা এহেন বদনাম রটিয়েছে জানি না। তবে আমার জন্য এটাই সত্য যে, দুপুরে ভাত না খেলে মনে হয় পেটপুরে খাবার খাওয়া হয়নি, পুষ্টিও বোধ হয় শরীরে কম গিয়েছে- যা আদৌ সঠিক নয়। বরং ভাতেই পুষ্টিগুণ কম। তা সে যাই হোক আজ দুপুরে ভাত না খাওয়ায় নিজেকে কেন যেন হালকা হালকা লাগছিল। সালাহউদ্দিন তরুণ। তার নাকি পেটে চনমন অবস্থা।

সাগরসৈকত থেকে এসে ঢুকেছি ওয়াকিং স্ট্রিটে। সৈকত সড়কের দক্ষিণ প্রান্ত থেকে শুরু হয়েছে ওয়াকিং স্ট্রিট। কত আর হাঁটা যায়। সুবিধাজনক একটা রেস্তরাঁ খুঁজছিলাম। বসাও হবে, বৈকালিক নাস্তাও হবে। ফাস্টফুডের দোকানেই পা দিলাম। নামে ফাস্টফুডের দোকান বটে। এখানে এমন কোনো ধরনের ফাস্টফুড শপ বা রেস্টুরেন্ট নেই যেখানে দ্রাক্ষারসযুক্ত পানীয় পাওয়া যায় না। একটি টেবিলও খালি নেই। খালি টেবিল না পেয়ে দাঁড়িয়ে আছি। ম্যানেজার দেখছে, খিদমতগারেরাও দেখছে, টেবিলের অতিথিরাও দেখছে। কারুরই কোনো বিকার নেই। তিন সারিতে অন্তত তিন পাঁচে পনেরটা টেবিল। টেবিলের সন্ধানে দুই সারির মাঝ বরাবর হাঁটছি। একটি টেবিল থেকে 'হাই' শব্দ শুনে দাঁড়ালাম। স্থূলদেহী এক শ্বেতকায় ভদ্রলোক। তার পাশে হাফ প্যান্ট ও স্যান্ডো গেঞ্জি পরিহিত থাই তরুণী। ভদ্রলোকের সাথে রাতে হোটেলে চোখাচোখি হয়েছে। সকালে নাস্তার সময়ও হাই-বিনিময় হয়েছে। আমাদের দুরবস্থা দেখেই সম্ভবত বসতে বললেন। বসতে দেরী করলাম না। পরিচয়-পর্ব সারতেই থাই তরুণী উঠে গেল। যাওয়ার সময় অবশ্যি হাত নেড়ে বিদায় জানাতে ভুল করেনি।

উনি ডেভিড, বয়স পঞ্চাশ, জাতে অস্ট্রেলিয়ান। অবলীলায় বলে গেলেন নিজের কথা। পেটে সুরা বোধ হয় পরিমাণের চেয়ে বেশি গেছে। পেটে সুরা বেশি গেলে মানুষ নাকি দিলখোলা হয়ে যায়। ডেভিড অবলীলায় বলে চলল নিজের কথা। 'কুড়ি বছর আগে এদেশে এসেছিলাম। এশিয়ার অনেক দেশেই গিয়েছি। কিন্তু এদেশটাই ভালো লেগেছে। কেননা এরা রক্ষণশীল না। ধর্মীয় গোঁড়ামি এদের নেই।' হুইস্কির গ্লাসটা পূর্ণ করে নিল ডেভিড। ফ্রায়েড চিকেন দিয়ে স্কস হুইস্কি খাচ্ছে। বোধ হয় নেশায় ধরেছে। ডেভিড বলে চলল, 'অস্ট্রেলিয়ায় আমার স্ত্রী ও দুই মেয়ে আছে। আমি থাকি সিডনিতে আমার ব্যবসায় নিয়ে। স্ত্রী মেয়েদের নিয়ে থাকে ক্যানবেরাতে, ও চাকরি করে। সে খুবই নাক-উঁচু স্বভাবের। বদরাগীও। আমি আর্থারাইটিসের রোগী। ছুটি নিয়ে কদাচিৎ-কদাচিৎ সিডনি এলেও আমার প্রতি যত্ন নেয়া তো দূরের কথা বাসায়ও থাকে কম, ভাই-বোনের বাসায় সময় কাটিয়ে রাতে ফেরে। আর থাই-নারীরা ভালো। খুব পতিব্রতা। আমি স্ত্রী লরাকে তালাক দিব। মাস তিনেক আগে এখানে এসে ডুয়ানফেন এর সাথে এক মাস কাটিয়ে গিয়েছি। ও ম্যাসাজ পারলারে কাজ করে। এ দফায়ও আমি ওর সাথে এক মাস থাকব।'

‘তাহলে এই লিভ টুগেদার কি তোমাদের বিবাহপূর্ব পরীক্ষাকাল?’

‘ইয়েস। ডুয়ান খুব ভালো মেয়ে ও বিয়ের পরে চাকরি ছেড়ে দিয়ে সন্তানের মা হবে। ও সকাল-বিকেল আমাকে রান্না করে খাওয়ায়। প্রতিদিন আমাকে ম্যাসাজ করে দেয়, যা আমার শরীরের ব্যথা-বেদনা দূর করার জন্য খুবই প্রয়োজন। এদেশের মেয়েদেরকে তুমি স্বামীর সাব-সারভেন্ট বলতে পার।’

‘তোমার ব্যবসা?’

‘হাঁ, আমি এবারই কাগজপত্র প্রস্তুত করে যাচ্ছি। আমি আমার ব্যবসা এদেশে নিয়ে আসব।’

‘তোমার মেয়েরা তোমাকে মিস করবে না?’

‘মিস করলে আমাকে দেখতে আসবে। এখনও তো ওরা বছরে দু’তিন বারের বেশি আসে না। মা-ই ওদের জীবন। ওরা আমাকে চেনে না।’

পারিবারিক সংকট ও তা থেকে বেরিয়ে মানুষটা শেষ বয়সে সুখের সন্ধান করছে। মদে চুর হয়ে অভিমানী ডেভিড প্রায় অপরিচিত মানুষের কাছে নিজের জীবনের কথা হরহর করে বলে গেল।

‘তোমরা আজ কী করলে আর কাল কী করবে?’

বললাম আমাদের আজকের ভ্রমণের কথা ও কালকের পরিকল্পনার কথা।

‘আই গেস বোথ অফ ইউ আর মুসলিম। অ্যাম আই কারেক্ট?

‘হাঁ, ঠিকই ধরেছ।’

‘ইয়েস। তোমরা খুব রক্ষণশীল। তোমরা জীবনটাকে উপভোগ করতে জান না।’

ডেভিডের চোখের সাদা অংশ লাল হয়ে উঠেছে। তরুণী ডুয়ানফেন পঞ্চাশোর্ধ বিশালাকৃতির বপুসমৃদ্ধ আর্থারাইটিসের রোগী এই ডেভিডকে বিয়ে করে কী পাবে? শংকরবর্ণের সন্তান পাবে। ডেভিডের ব্যবসায়ের উত্তরাধিকারী হবে। ডেভিড যদি কোনো কারণে ওকে ছেড়ে দিয়েও যায় তবুও এদেশের আইন অনুযায়ী ডেভিডের বিপুল বিত্তের অংশবিশেষ পাবে। তারপরে হয়ত সে আবারও পারলারের চাকুরিতে ফিরে যাবে। আবার তা নাও হতে পারে। ডেভিড দীর্ঘজীবী হতে পারে। ডুয়ানফেন এক বৃদ্ধের স্ত্রী হিসেবে সচ্ছল জীবন যাপনের সুযোগ পাবে।

(চলবে)

মিথের মাহাত্ম্য : অন্য আলোয় মিথের পুনর্পাঠ

আহমেদ দীন রুমি

মিথ এবং মিথোলজি

শিশু জন্ম নেয়ার পর ধীরে ধীরে চিনে নেয় বাবা-মাকে। সত্যিই কি চিনে নেয়? নাকি চিনিয়ে দেয়া হয়? একটা বিশ্বাস আটকে দেয়া হয় সরল মস্তিষ্কে। একটা মিথ। শিশু বাড়ে, বাড়ে মিথ। রূপে আর পরিমাণে। তারপর...

OPAE নামের মেয়েটা গর্ভবতী হলো। অথচ তাঁর কোনো স্বামী নেই। যায়নি কোনো পুরুষের মোলাকাতেও। যেহেতু সমাজ একথা বুঝতে নারাজ, সেহেতু ইজ্জতের ডরে অন্যরকম সিদ্ধান্ত নিলো মেয়েটা। গোপনে জঙ্গলে ফেলে আসলো সন্তানকে। একটা পাখি কিন্তু ঠিকই দেখে ফেললো ঘটনা। তারপর কোত্থেকে যেনো বাকল আর পাতা এনে ঢেকে দিলো পরিত্যক্ত শিশুকে। সময়ের ব্যবধানে শিশুটি একটা গাছে পরিণত হলো। এটাই পৃথিবীর প্রথম ট্যারু গাছ, ঐ অঞ্চলের মানুষের জীবন যাপনের অন্যতম অবলম্বন। গল্পটা নিউ গিনির হলেও এরকম অজস্র গল্প আছে অন্যান্য সংস্কৃতিতেও। টিকে আছে অনেকটা শ্রদ্ধা পেয়েই। বিশেষ এই গল্পগুলোর বিশেষত্ব কেবল সংশ্লিষ্ট উপাদানে না, বর্ণনার প্যাটার্নেও। মিথের মাহাত্ম্য এখানেই।

গ্রীক শব্দ Mythologia থেকে লাতিন এবং ফরাসি ভাষা ঘুরে ইংরেজিতে Mythology শব্দটি এসেছে। গ্রীক Muthos এর মানে গল্প, বয়ান কিংবা পৌরাণিক আখ্যান হলেও তাৎপর্যগতভাবে Mythology এর বিস্তৃতি বিশাল। এতোটাই বিশাল ও বৈচিত্র্যময় যে, অর্থের ফ্রেমে বাঁধতে চাওয়াটা নেহাত বোকামি। ইঁদুরের গর্তে নীলতিমি ঢোকাতে চাওয়ার মতোন।

মিথ আর মিথোলজির মধ্যে যেহেতু কিঞ্চিৎ ফারাক আছে, তাই মিথ থেকেই শুরু করা যাক। এককথায় মিথ হচ্ছে সমাজ বা সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত পবিত্র ধারণাগুলোর শাব্দিক উপস্থাপন। কখনো কখনো মিথ এমন একটি গল্প, যা ব্যাখ্যা করে কোনো কিছু কেনো অস্তিত্বশীল। উদাহরণস্বরূপ দক্ষিণ আমেরিকার জমজ সন্তানের মিথ আনা যেতে পারে। অথবা মিথ ব্যাখ্যা করবে কোনো ধর্মীয় আচার কেনো পালিত হয়। বাইবেলের অনুসরণে আব্রাহামিক ধর্মের খৎনার কথা এক্ষেত্রে যুতসই। অথবা মিথ হচ্ছে প্রাকৃতিক শক্তিগুলোর ব্যাক্তিরূপে উপস্থাপন। যেমন: গ্রীক মিথে ভালোবাসার দেবী আফ্রোদিতি, বজ্রের দেবতা জিউস এবং এরকম সবাই।

এতোকিছুর পরেও কিছু কথা থেকে যায়। যীশু খ্রিষ্ট নবি ছিলেন নাকি আল্লাহর পুত্র- সত্যতা নির্ণয়ে বাহাস হতে পারে। পক্ষে বা বিপক্ষে কিংবা দুইয়ের মাঝামাঝি সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে। সেই খতিয়ান অন্যদিকের। যে কোনো একটা সিদ্ধান্তই যীশুর একটা কাল্ট দাঁড় করায়। সেই কাল্টকে ঘিরে একটা সমাজ গড়ে উঠারও নজির কম নেই। এই সমাজ রক্তসম্পর্কীয় সমাজের বন্ধন থেকে কম দৃঢ় না। তাঁর অন্যতম কারণ- এখানে ঐশী ধারণার সাথে যোগাযোগ আছে। যাই হোক, এতো ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে আমরা শুধু একটা কথা সামনে আনতে চাচ্ছি। তা হলো- শুধু দেবতাদের আখ্যান মিথ না। সত্য, মিথ্যা কিংবা উভয়ের ভেতর থেকে

বের হয়ে আসা এমন প্রচারণাকে আমরা মিথ বলতে পারি; যার সাথে স্বর্গীয় সংজ্ঞায়ন যুক্ত। যীশুর প্রভাব কোনো অংশেই জিউসের চেয়ে কম না। পাকিস্তানের ইতিহাসে জিন্নাহ্ প্রমিথিউসের চেয়েও তাৎপর্যপূর্ণ। সমকালীন কিংবা পরবর্তী সমাজ ও সংস্কৃতির উপর ক্রিয়াশীল নিয়ামক দেখে মিথ শনাক্ত করা যায়। একটা শিশু জন্ম নেবার সাথে সাথে তাঁর সামনে উপস্থাপিত হয় সমাজ, দেশ এবং ধর্ম। হাজির করা হয় কোনটা পবিত্র আর কোনটা অপবিত্র- সেই জ্ঞান। যুক্তি আর বুদ্ধি অদ্ভুতভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় অন্যকিছুর দ্বারা। যারা এই কর্তৃত্ব করে, প্রায়শ তারাই মিথ।

মিথ আর ফোকলোর কি এক? অবশ্যই না। নিতান্ত সাধারণ পাঠকও মিথকে অন্যান্য গল্প থেকে আলাদা করতে পারে। কীভাবে? কারণ সকল মিথের ভেতর একটা বিশেষ অনুরণন আছে। আর তা হলো- মিথ এমন ব্যাখ্যা এনে সামনে হাজির করে, যার ভিন্ন ব্যাখ্যা পাঠকের মস্তিষ্কে আগে থেকেই আছে। পাঠকের মস্তিষ্কে বিশ্বাসযোগ্য অবস্থায় ক্রিয়াশীল সেই ব্যাখ্যাকে আমরা 'ফ্যাকচুয়াল মিথ' (Fcactual Myth) হিশেবে নামকরণ করবো। জরাথুস্ত্রবাদ অনুসারে, পৃথিবী সৃষ্টির পেছনে আহুর মাজদা এবং আঙরা মাইনু বা আহরিমানের ধারণাকে সজোরে মিথ বলে আখ্যা দেবে সেমেটিক ট্রাডিশনের ধর্মগুলো। এর কারণ, তাঁর মস্তিষ্কে ফ্যাকচুয়াল মিথ হিশেবে পৃথিবী সৃষ্টির অন্য ধারণা ক্রিয়ারত। অনুরূপভাবে সেমেটিক সৃষ্টিবাদ একজন জরাথুস্ত্রবাদীর কাছেও মিথ মাত্র। একে আমরা 'নমিনাল মিথ'(Nominal Myth) হিশেবে নামকরণ করবো। অর্থাৎ পাঠক যে মিথ সম্পর্কে রায় দিচ্ছে, তা নমিনাল মিথ। আর যে মিথের মধ্যে বসবাস করছে, তা ফ্যাকচুয়াল মিথ। বাঙালি সংস্কৃতিতে বাস করে একজন কট্টর বাঙালির চর্চিত বিশ্বাস ফ্যাকচুয়াল আর পাশাপাশি আরব, তুর্কি, ইরানী কিংবা অন্য যেকোনো সংস্কৃতির বিশ্বাস তখন নমিনাল। নবি মুহম্মদ দ. এর সবচেয়ে বড় সফলতা ছিলো এইখানে। তিনি গোত্রীয় বহু বিভাজিত মিথকে কা'বাকেন্দ্রিক একটি মিথ দিয়ে প্রতিস্থাপিত করেছেন। প্রত্যেকটা মহাপুরুষ মূলত এই কাজটাই করেন। আধুনিক বিশ্বের বিজ্ঞান তাঁর নিজস্ব মিথ দিয়ে সেই কাজগুলোই করছে, মধ্যযুগে যা ধর্ম করতো।

যাইহোক, ফ্যাকচুয়াল এবং নমিনাল উভয় মিথকে সামনে দাঁড় করালে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো দেখা যায়-

১. ঘটনার চরিত্র অন্যান্য গল্প থেকে আলাদা। প্রায়শ মিথগুলোতে কোনো দেবতা, উপদেবতা কিংবা অপদেবতা জড়িত থাকে। একে বরং আরেকটু আধুনিক করে বলা যেতে পারে। মিথে সংশ্লিষ্ট চরিত্রের দেবতাকরণ করার প্রয়াস থাকবে। পীর-ফকির কিংবা জাতীয়তাবাদী নেতার কাল্ট আমরা অনায়াসে সামনে আনতে পারি উদাহরণ হিশেবে।

২. একটা সংস্কৃতিতে লালিত বিশ্বাস এবং পবিত্র কিছুর ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হয় মিথে। এখানে পবিত্র মন্ত্র বা শব্দ, পবিত্র কাজ বা ইবাদত এবং পবিত্র স্থান- এই তিনটির যেকোনো একটি থাকবে। নবজাতক শিশুর পিতা যখন ধর্ম কিংবা রাষ্ট্র যখন সংবিধান হাজির করে, তা পবিত্র আর আজীবন মান্য হিশেবেই আসে। সত্যযুগে ভারতের কোন অঞ্চলে কোন ইবাদতের চর্চা হতো, তা পরের বিষয়। প্রায়োর হলো- বর্তমানে কি চর্চিত হচ্ছে। মিথ দুটোই।

৩. সাধারণ গল্পগুলো আমাদের একটা নির্দিষ্ট সময়ে নিয়ে যায়। অনেকটা Once upon a time দিয়ে শুরু হবার মতো। কিন্তু মিথ নিয়ে যাবে সময়ের শুরুতে। যেমন বাইবেলের জেনেসিস বলছে- In the beginning, GOD created the heavens and the earth.

৪. মিথ তর্ক করবে না। শুধু উপস্থাপন করবে। অর্থাৎ যুক্তি প্রমাণের তোয়াক্কা নেই। কেউ গ্রহণ করতে চাইলে একে মেনেই গ্রহণ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ মিসরীয় খেপরি পুরাণের উক্তি তুলে ধরা যায়- I spat out what was shu, and I sputtered out what was tenfut.
৫. সময়ের আগ্রাসী স্রোত, পরিস্থিতির টানাপোড়েন- তবু যুগ যুগ ধরে টিকে থাকা মিথগুলো মূলত সাক্ষ্য দেয় তাদের Extraordinary authority-এর। ব্যাখ্যাগুলো কেউ তৈরি করে নি। স্বর্গীয়ভাবে মানব সমাজে প্রোথিত। এটা মিথের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

মিথোলজি হচ্ছে কোনো একটি নির্দিষ্ট সংস্কৃতি বা সভ্যতায় চর্চিত মিথগুলোর সামগ্রিক রূপ। সে হিশেবে ইণ্ডিয়ান মিথোলজি বলতে বুঝায় ভারতীয় সভ্যতায় বিরাজিত সমগ্র মিথ। রামের সীতা উদ্ধারের আখ্যান এবং পাণ্ডবদের কৌরববধের আখ্যান দুটি আলাদা মিথ। কিন্তু দুটোই ইণ্ডিয়ান মিথোলজির অন্তর্ভুক্ত। মিথোলজির অপর সংজ্ঞা- মিথকে পাঠ করবার বিদ্যা। প্রাচীন গ্রীস থেকে আধুনিক যামানা পর্যন্ত নানা রঙে নানাভাবে মিথের তর্জমা-তাফসির হচ্ছে। প্লেটো বা তাঁর আগে থেকে লেভি স্ত্রাউস, ইয়াং, মির্চা এলিয়াদ এবং যোসেফ ক্যাম্পবেল হয়ে আজ পর্যন্ত মিথ পাঠ করার যে কাঠামো তৈরি হয়েছে, তাঁর পরিধি কম না। অজস্র পণ্ডিতের ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি বগলে করে গড়ে উঠা এই শাস্ত্রই মিথোলজি। এর মানে এই নয় যে- মিথের পাঠ আমাদের পৌরাণিক সময়ের সাঁকো দিয়ে হাঁটাবে। অবশ্যই মিথোলজির পাঠ কল্পনার জগত সম্পর্কে অভিজ্ঞতা দেয়। মিথোলজির অধ্যয়নের জন্য সিম্বল নিয়েও ঘাটাঘাটি তাই জরুরি। কিন্তু তারচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো- মিথের পাঠ আমাদের সক্ষম করে তোলে বর্তমানে প্রচলিত মিথকে শনাক্ত করতে। আবারো স্মরণ করাতে চাই, মিথ বলতে আমরা সত্য বা মিথ্যা বলছি না। মিথ সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থা।

মিথের প্রভাব

ডিউডেলাস ছিলেন তাঁর সময়ের বিখ্যাত আবিষ্কারক। ঘটনাক্রমে ক্রিটের রাজার বিরাগভাজন হন। রাজা মিনোস ডিউডেলাস এবং তাঁর পুত্র ইকারাসকে কয়েদ করে রাখলেন ল্যাবিরিন্থে। এ এক ধাঁধাঁলো কারাগার, বের হওয়া অসম্ভব। তবুও হতাশ হন নি জ্ঞানী ডিউডেলাস। প্রতিদিন অল্প অল্প করে মোম নিয়ে পাখা বানালেন নিজের ও পুত্রের জন্য। তারপর একদিন উড়াল দিলেন আকাশে। পুত্র ইকারাসের প্রতি উপদেশ ছিলো বেশি নীচে বা উপরে না উড়ার। নীচে সাগরজলে পাখা ভিজে যাবার সম্ভাবনা আর উপরে সূর্যের উত্তাপে গলে যাবার। ইকারাস কিন্তু ওই ভুলটাই করলো। উড়ার জোশে উপরে যেতে যেতে চলে গেলো সূর্যের কাছাকাছি। পরিণামে পাখা গলে আছড়ে পড়লো সাগরজলে- মৃত্যু।
প্রথম পাঠেই গল্পটাতে মধ্যমপন্থা অবলম্বনের ইঙ্গিত চোখে পড়ে। এরিস্টটল যখন তাঁর নিকোমেকিয়ান ইথিক্স-এ Golden mean এর কথা বলেন, আরব উপদ্বীপের নবি মুহম্মদ দ. যখন সাহাবিদের মধ্যবর্তী পথের ডাক দেন, শাক্যমুনি বুদ্ধ যখন মধ্যমপন্থার ধারণা দেন- তখন ইকারাসের প্রতি ডিউডেলাসের উপদেশ আরো বিস্তৃত অর্থ লাভ করে। অন্যদিকে ইকারাসের মৃত্যু ইকারাসের জন্য ছিলো বুদ্ধিভ্রষ্ট হবার পরিণাম এবং ডায়ডেলাসের জন্য পূর্বকৃত পাপের। চোখের সামনে পুত্রের মৃত্যু দেখা যে-কোনো পিতার জন্য শাস্তিই বটে। যাই হোক, একটা মিথ কীভাবে ধর্ম, দর্শন আর বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে, তাঁর উৎকৃষ্ট নজির ইকারাসের মিথ। প্রত্যক্ষ কিংবা

প্রচ্ছন্নভাবে মিথের গন্ধ মিশে থাকে ধর্ম, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির শরীরে।

সবার আগে আসে ধর্মের নাম। নৃতত্ত্ববিদগণ টোটেম-ট্যাবু ধারণার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন অনেক আগেই। প্রাচীন সেই বিশ্বাসই কাঠামো দিয়েছে ট্রাইবকে। গড়ে উঠেছে নানা আচার ও বিঁধি-নিষেধ। এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত নিয়াণ্ডার্থাল মানুষের কবর এবং মিসরীয় মমি তাদের ধর্মবিশ্বাসকেই প্রতিফলিত করে। সত্যি বলতে ধর্মের সামগ্রিক ইতিহাসে মিথের আধিপত্য ছিলো একচেটিয়া। নবি মুসা ফেরাউনের গোলামী থেকে বনী ইসরাইলকে রক্ষা করে কেমন ঐতিহ্য চালু করেছেন, সে পরের কথা। কিন্তু পারস্য, আসেরীয়, রোমান এবং হাল আমলের হিটলারের আঘাতও যে তাঁদের ঐতিহ্য উপরে ফেলতে পারে নি, তার কারণ তাঁদের পেছনে খোদা তা'লার বিশেষ প্রতিরক্ষা নয়। কারণ নিজেদের ঐতিহ্য ও মিথের প্রতি কঠোর আনুগত্য।

আবার একটা গোত্রের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা স্থাপন, বাহিরের গোত্রের সাথে টিকে থাকার স্বার্থে সম্পর্ক নির্ধারণ, মিত্রতা কিংবা যুদ্ধ- যে কোনো পরিস্থিতিতে দারুণভাবে ব্যবহৃত হতে পারে মিথ। সম্রাট কনস্টানটাইন যখন ধর্মান্তরিত হন কিংবা ব্রিটিশরাজ যখন Defensor fidei অর্থাৎ 'বিশ্বাসের রক্ষক' নাম ধারণ করেন, অথবা মুসলিম শাসক 'আমিরুল মু'মেনীন' নাম নেন, তখন কেবল ধর্ম সামনে আসে না। আসে রাজনীতি, ক্ষমতা আর মিথের ধারণাও। চতুর্থ আমেনহোটেপের ইখনাটন অর্থাৎ 'এটন যার উপর সন্তুষ্ট'- নাম নেবার সাথে তাৎপর্যগতভাবে এর খুব বেশি ফারাক নেই। একটা মিথ একটা সমাজ তৈরি করে। দুটি সমাজের ভেতরে যার মিথ শক্তিশালী, সেই-ই বিজয়ী হবে। কেননা, শক্তিশালী মিথ ভেঙে দিতে পারে রক্তের সম্পর্ককেও। বশীভূত করে রাখে অচেনা ব্যাক্তিকেও। সার্থক মিথ তৈরি করার মাধ্যমে শাসক কেবল স্বীয় রাজ্যে বিদ্রোহের রাস্তাই বন্ধ করেন না। পাশাপাশি জনতাকে পক্ষে রেখে তখতের মেয়াদ দীর্ঘ করেন। একটা মিথিকাল ফিগার দাঁড় করাতে পারাটা রাজনীতির মাঠে প্রতিপক্ষকে কুপোকাত করার সার্থক অস্ত্র। যুদ্ধের মাঠে নিজের দলকে চাঙা রাখার চাবি। ধর্মের ময়দানে এর প্রয়োজন অন্যান্য সকল ক্ষেত্রের চেয়ে বেশি।

গ্রীক শষ্যের দেবী দিমিতিরের কন্যা পার্সিফোনিকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় পাতালে। ক্রোধান্ধ দিমিতির এবং তাঁর পরবর্তী আখ্যান নির্দেশ করে গ্রীসের ঋতুবৈচিত্র্য। অন্যদিকে প্রমিথিউসের আগুন আনবার ঘটনা সামনে আনে মানুষের সাথে আগুনের সম্পর্ক। ক্রুদ্ধ জিউসের প্লাবন দিয়ে পৃথিবী ধ্বংসের সিদ্ধান্ত আঙুল তোলে বন্যার দিকে। বলে রাখা ভালো, মহাপ্লাবনের স্মৃতি প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্য প্রায় প্রতিটা সংস্কৃতিই বলে গেছে। মোদ্দাকথা, মিথ ছিলো প্রাকৃতিক অলঙ্ঘ নিয়মগুলোকে ব্যাখ্যা করার বিশ্বস্ত সূত্র। একে একদিক থেকে বিজ্ঞানের শিশুকাল বলা যেতে পারে। অন্যদিক থেকে বলা যেতে পারে, দর্শন ও সমাজ ধারণার আদিরূপ। সবচেয়ে সত্য হয় মানুষের অস্তিত্বচেতনা এবং উপলব্ধির দিকে আঙুল তোললে।

পূর্বের মহাভারত আর রামায়ণ, পশ্চিমের ইলিয়াড আর ওডিসি। গ্রীসের নাটক এমনকি দর্শনেও মিথের প্রভাব ছিলো তাৎপর্যপূর্ণ। এজন্য জেনো বা এরিস্টটলেরাও পিঠ ঘুরিয়ে থাকেননি অথবা থাকতে পারেন নি। প্লেটোর গুরু সক্রেটিস মৃত্যুকালে বলেছিলেন: "Crito, we owe a cock to Asclepius. Do pay it. Don't forget."

বলা বাহুল্য, এখানে উল্লেখিত এস্ক্লিপিয়াস আরোগ্যের দেবতা। দেবতা এপোলো এবং করোনিস এর পুত্র। অনুরূপ কাহিনী দেখা যায় এখনো। এপোলো কিংবা এস্ক্লিপিয়াস নেই হয়তো। কিন্তু নতুন সময়ে নতুন সংস্কৃতিতে নতুনরূপে সামনে এসেছে সেই পুরোনো মিথ।

ইবনে খালদুন তাঁর মুকাদ্দিমাতে একটা নতুন রাজবংশ উত্থানের পেছনে প্রোপাগাণ্ডার ভূমিকা ব্যাখ্যা করেছেন। মেসিয়ানিক প্রোপাগাণ্ডা কীভাবে রোমান সাম্রাজ্যকে গরম করে ফেললো আর মাহদী প্রোপাগাণ্ডা কীভাবে ফাতেমীয় বংশকে রাজক্ষমতা দিলো- তার সাক্ষী ইতিহাস। এরচেয়ে পোক্ত প্রমাণ বর্তমানের বায়তুল আকসা এবং জেরুজালেম সংকট। আন্তঃআব্রাহামিক ধর্মের ফ্যাকচুয়াল এবং নমিনাল মিথের সংঘর্ষ। পেছনে আমরা প্রোপাগাণ্ডাকে মিথ বলে এসেছি। দুই লাইনের সংজ্ঞায় না দাঁড় করিয়ে একটা স্বতন্ত্র জগৎ হিশেবে সামনে ধরলে মিথ পাঠ অনেকাংশে অর্থপূর্ণ হবে। ইতিহাসের বিভিন্ন বাঁকে মিথ সভ্যতার অন্যতম নিয়ামক হিশেবে ছিলো, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। সে অর্থে Homo Sapiens-কে অসংকোচে Homo Muthos বলা যায়।

মিথের তর্জমা-তফসির

সময়ের বিভিন্ন বাঁকে মিথকে পাঠ করা হয়েছে বিভিন্নভাবে। ব্যাক্তি কিংবা সময়ের ভিন্নতায় কখনো ইতিহাস কখনো যুক্তি কখনো বা অন্য কোনো পাটাতনে দাঁড় করানো হয়েছে মিথকে। কখনো ভেঙে ভেঙে, কখনো সামগ্রিক থেকে অর্থ বের করা হয়েছে। যেহেতু এই জগৎটা আলো-আঁধারির। বুকে হাত দিয়ে 'আমিই সঠিক' বলার দুঃসাহস দেখাতে পারে না কেউ। তাতে বরং ভালোই হয়েছে। অনায়াসে ঢুকে পড়া যায় এক অদ্ভুত ভাষার রাজত্বে। লক্ষ বছর বয়সী কোনো দাদু যেনো দাড়ি নাচিয়ে বলে চলছেন তার সময়ের পৃথিবীকে।

ক্লাসিক্যাল পৃথিবী বলতে আমরা প্রাচীন গ্রীস আর রোমকেই বুঝি, অথবা বলা ভালো- আমাদের বুঝানো হয়। আড়াই হাজার বছর আগের সেই চিন্তাশীল সমাজে মিথের তিন ধরণের পাঠ দেখা যায়। প্রথম পক্ষের দাবী ছিলো মিথ রূপক। অর্থাৎ সকল প্রকার মিথ দার্শনিক সত্যকে রূপক হিশেবে উপস্থাপন করার প্রয়োজনেই গড়ে উঠেছে। এই তত্ত্বের পক্ষে ছিলো প্লেটো, এম্পিডক্লিস এবং হেরাক্লিটাসের মতো বাঘা বাঘা পণ্ডিতেরাও। তাঁদের মতে, হেক্টরবধ, ট্রয়ের যুদ্ধ, বীর ওডিসিয়াসের ঘরে ফিরে আসা নিয়ে বিড়ম্বনা- সব গল্পই মূলত রূপক। ভারতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ, রামের সীতা উদ্ধার এবং রাঁধা-কৃষ্ণের আখ্যান নিয়ে অনুরূপ দাবী করা যায়। সেই চোখ দিয়ে দেখলে মহাভারতের পাণ্ডব-কৌরব দ্বন্দ্ব রূপকভাবে শুভাশুভের চিরন্তন দ্বন্দ্বকে অংকন করা হয়েছে। পঞ্চপাণ্ডবের প্রত্যেকে এক একটি বিশেষ গুণের প্রতিনিধিত্ব করে। তার সাথে যুক্ত হয়েছে ফ্যামিনিটি (দ্রুপদীরূপে) এবং ডিভাইনিটি (কৃষ্ণরূপে)। বিপরীতপক্ষে দুর্যোধন-দুঃশাসনসহ শত কৌরব প্রতিনিধিত্ব করে শত পাপের। এভাবে অর্থ বের করা যায় পূর্ব পশ্চিমের অন্যান্য মিথ থেকেও।

যুক্তির চালুনি হাতে এরপর হাজির হন জেনো। যদি গাধাকে তার স্রষ্টার ছবি আঁকতে দেয়া হয়, তবে আঁকা ছবিটাও একটা গাধারই হবে। তাঁর সিদ্ধান্ত ছিলো বিপ্লবী। এই চোখে দেখলে- অলৌকিকতার মোড়কে যে গল্পগুলো আমাদের সামনে হাজির, তা মানুষেরই সৃষ্ট। আর এজন্যই দেবতারা মানবিক। খোদাতা'লার গুণাবলি যতোটা না তাঁকে মহিমান্বিত করে, তারচেয়ে বেশি সংজ্ঞায়িত করে মানুষের অনুধাবন ও চিন্তনশক্তিকে। এইজন্যই যতো দিন অতিবাহিত অচ্ছে, ঈশ্বরবাদীদের ঈশ্বরের ধারণা ততো এবস্ট্রাক্ট হচ্ছে। সময়ের সাথে মানুষের বেড়ে উঠার ইতিহাস অন্য অর্থে ঈশ্বরের বেড়ে উঠার ইতিহাস। জিউস কিংবা মহাদেবের মর্ত্যে নেমে আসা, দেবীতে দেবীতে মনোমালিন্য, দেবতা-দেবতায় যুদ্ধ; অন্য জগতের কিছুর না, মানুষের ভেতরের যৌনতা, ক্রোধ এবং প্রতিহিংসার প্রকাশ। মানুষ

তাঁর ভেতরের ভয়, লোভ এবং অভিপ্রায়কে বিশ্বাসের বলয় দিয়ে সামনে এনেছে। মিথ পাঠের এই তত্ত্ব মানুষের আচার, সমাজচিন্তা, মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সংজ্ঞায়নে তাৎপর্যপূর্ণ।

ক্লাসিক্যাল যুগে মিথ পাঠের তৃতীয় ধারণার নাম ইউহেমারিজম। একে অন্য কথায় মিথের ঐতিহাসিক পাঠ বলা যেতে পারে। ইউহেমারাস নামক গ্রীক পণ্ডিত প্রথম দাবী করেন- যাদেরকে দেবতা জ্ঞানে টঙে তুলে রাখা হয়েছে তারা মূলত ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। দেবতা জিউস ছিলেন প্রকৃতপক্ষে ক্রিটের একজন শক্তিশালী শাসক আর তাঁর সম্পর্কে গড়ে উঠা মিথ প্রকৃতপক্ষে ইতিহাসের অতিরঞ্জন। এভাবে পার্সিয়াস, হারকিউলিস কিংবা প্রমিথিউসকেও ব্যাখ্যার আলোয় আনা যায়। ভারতীয় মিথ নিয়ে যে ঐতিহাসিক পাঠের দাবী নেই, তা না। রামের লঙ্কা অভিযান, রাবণবধ, কৌরব-পাণ্ডব টানাপোড়েন এবং কুরুক্ষেত্রের রক্তপাত- ঘটনাগুলোকে ইতিহাস হিশেবে উপস্থাপনের প্রয়াস উল্লেখযোগ্য। গঙ্গার অস্তিত্বশীলতা, জগন্নাথের মন্দির, কাশী- প্রভৃতি ধারণাতে ইতিহাস আর মিথ একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

ক্লাসিক্যল যুগের পরে আসে ক্যাথলিক যুগ। ক্রিশ্চিয়ান ধর্মের প্রচারকেরা বেশ ভালোভাবে রপ্ত করেছিলো ইউহেমারিজমের ধারণা। তাঁদের প্রথম আর প্রধান শত্রু প্যাগানদের বিরোধিতা করতে প্যাগান দেবতাদের অযোগ্যতা প্রমাণ করার সুযোগ এরচেয়ে ভালো আর কী? ক্লিমেন্ট অব আলেক্সান্দ্রিয়ার মতো অনেকেই টিপ্পনি কাটতে থাকে- Those to whom you bow were once men like yourselves.

এই প্রচারণার অভূতপূর্ব শক্তিও সেই কারণগুলোর একটি, যার প্রভাবে প্যাগানিজমের বুকের উপর স্থাপিত হয় খ্রিষ্টীয় ঝাণ্ডা।

অষ্টাদশ শতক থেকে মিথ সম্পর্কে ধারণা অনেকটা বদলাতে থাকে। সামঞ্জস্য পাওয়া যেতে থাকে দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন মিথের সাথে গ্রীস এবং রোমান মিথের। পণ্ডিতমহলে আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। মিথকে গণ্য করা হয় মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক শিশুকালের স্বাক্ষর হিশেবে। রোমান্টিক যুগে ভাষাবিজ্ঞানের আলো ফেলা শুরু হয়। শুরু হয় আর্ট, কৃষ্টি এবং আচারকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সংস্কৃতির মিথের তুলনামূলক অধ্যয়ন । বই লেখা হতে থাকে Mythology এবং Symbolism এর উপর।

উনবিংশ শতকে বিবর্তনবাদের স্রোত এইদিকেও আঘাত হানতে ভুল করেনি। ডারউইনের জীববিবর্তন, মার্কসের সমাজ বিবর্তন এবং ফ্রয়েডের মনোবিবর্তন- হাত বিস্তার করে মিথের ব্যাখ্যা দেবার জন্যও। এরমধ্যে যুক্ত হয় প্রচুর তত্ত্ব-উপাত্ত। বৈদিক পণ্ডিত ম্যাক্স মুলার, নৃবিজ্ঞানী জেমস জর্জ ফ্রেইজার এবং এডওয়ার্ড বার্নেট টেইলর অভাবনীয় সংযোগ ঘটান । বিভিন্ন অঞ্চলের মিথকে সংগ্রহ এবং তা থেকে অর্থ বের করবার বিদ্যা হিশেবে ব্যাপক ক্ষেত্র তৈরি হয়।

বিশ শতক ছিলো মিথ পাঠের স্বর্ণসময়। কার্ল ইয়াং মনস্তাত্ত্বিক অনুসন্ধানের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। মিথের পেছনে তিনি কিছু নির্দিষ্ট সুপ্ত অবচেতন মনস্তাত্ত্বিক শক্তির খোঁজ করেছেন। যার নাম দিয়েছেন আর্কিওটাইপ। পৃথক সংস্কৃতির মিথের মধ্যে সাদৃশ্য মূলত এই আর্কিওটাইপের উপর নির্ভর করে। লেভি স্ট্রাউস মানব মনের সহজাত প্যাটার্নের ধারণা বলেই উপস্থাপন করেন মিথকে। ইডিপাসের মিথসহ অন্যান্য মিথ দিয়ে এই গঠনবাদী পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন জোড় বিপরীত ধারণার সাথে। যেমন- আলো বনাম অন্ধকার, রুক্ষতা বনাম দয়ার্দ্রতা, সুন্দর বনাম কুৎসিত ইত্যাদি।

জোসেফ ক্যাম্পবেল মিথকে মানুষের আধ্যাত্মিক সম্ভাবনার মেটাফোর উপস্থাপন হিশেবে দেখতে চান। মির্চা ইলিয়াদ দেখেন মানুষের পবিত্রতার জ্ঞান। যাইহোক, পাঠ করবার ধরণে ভিন্নতা কিংবা অর্থপ্রাপ্তিতে পৃথক সিদ্ধান্তে উপনীত হলেও মিথের আবেদন এবং মূল্যায়ন বোদ্ধামহলে বাড়ছে বই কমছে না। একবিংশ শতকের এই সময়ে মিথ নিয়ে বিভিন্ন টেলিভিশন প্রোগ্রাম এমনকি বিগ বাজেটের মুভির নাম দেখলেই তা স্পষ্ট হয়। সাথে সাথে পার্টিকুলার এবং কম্পারেটিভ মিথোলজি নিয়ে প্রকাশিত এবং প্রকাশিতব্য বইগুলো তো আছেই। যদিও মিথ বলতে এখন পর্যন্ত 'নমিনাল মিথ'কেই পাঠ করা হচ্ছে। ব্যক্তি নিজে যে মিথের সাগরে ডুবে আছে, সে বিষয়টা থেকে গেছে অজ্ঞাতেই। অথবা বলা যেতে পারে- হয়তো অস্তিত্বের সংকট নয়তো ক্ষমতার হিশাবনিকাশ থেকেই বারবার চেপে যাওয়া হয়েছে একটা অংশ- ফ্যাকচুয়াল মিথ। যার বুকের উপর দিব্যি হেসে-খেলে রাত পোহাচ্ছে কৌশলী আধিপত্যবাদী। হয়তো সচেতনে অথবা অবচেতনে।

ইসলামী দৃষ্টিতে শিল্পকলা এবং ঐতিহাসিক *শিখা*র দৃষ্টিভঙ্গি

মুহাম্মদ আবু সাঈদ

বাঙালি মুসলমানের সঙ্কীর্ণতা দূর করার জন্য, প্রতিবেশী হিন্দু সমাজ থেকে কমসে কম শত বৎসর পিছিয়ে পড়া বাঙালি মুসলমানের সর্বক্ষেত্রে 'বুদ্ধির মুক্তি'র জন্য অধ্যাপক আবুল হোসেন, কাজী আবদুল ওদুদ, কাজী মোতাহার হোসেন, কবি আবদুল কাদির প্রমুখ কয়েকজনের নেতৃত্বে ১৯২৬ সালে গঠিত হয় "মুসলিম সাহিত্য সমাজ"। এই সাহিত্য সমাজের বিচরণক্ষেত্র কেবল সাহিত্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বাঙালি মুসলমানের বিভিন্ন সমস্যা— সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়— নানা সমস্যা ও সমাধান নিয়ে তাঁরা আলোচনা করতেন— অবশ্যই প্রগতিশীল দৃষ্টিতে। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'র বার্ষিক মুখপাত্র হিসেবে ১৯২৭ সালে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় *শিখা*। ১৯২৭ থেকে ১৯৩১— এ পাঁচ বছরে পাঁচটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে কেবল, সংখ্যা হিসেবে একেবারে গোনায় ধরার মতো মনে না হলেও এর ঐতিহাসিক মূল্য অবশ্য-স্বীকার্য, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজের পক্ষে শিখা মুসলমানদেরকে গতানুগতিক পথ থেকে ফিরাবার সাধনা করেছে' বিধায় অন্তত বাঙালি মুসলমানের ইতিহাসে 'শিখা'র গুরুত্ব অনস্বীকার্য— প্রগতিশীলতার বিচারে তো 'উন্নত সাহিত্য পত্রিকাসমূহেরও শ্রেষ্ঠ আদর্শের এক তাৎপর্যপূর্ণ সাহিত্য পত্রিকা'। "জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব"— এই স্লোগানকে শিরে ধরে যাঁরা চলবেন তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই উন্নত চিন্তা ও মুক্ত বুদ্ধির অধিকারী হবেন। এবং ১৯২৬ সালে বাঙলার মুসলমান সমাজে এমন 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলন করা রীতিমতো বিপ্লব, বিদ্রোহ বলা যায়— প্রত্যেকজনকে বলা যায় একেকজন বিপ্লবী, বিদ্রোহী।

মুসলিম সমাজে সঙ্গীত, ছবি এবং মঞ্চে অভিনীত নাটক সর্বোপরি শিল্পকলা সম্বন্ধে সবসময় একটা নেতিবাচক ধারণা থাকে, যারা এসবের সঙ্গে যুক্ত থাকেন কিংবা এসবের প্রতি আকৃষ্ট হন তাদের মধ্যে ভয়াবহ রকমের 'ফতোয়াভীতি' থাকে। আর মৌলবাদী গোষ্ঠীও ওঁত পেতে থাকে ফতোয়া প্রদানের জন্য। অসুস্থ শিল্পকলার তো প্রশ্নই ওঠে না, সুস্থ শিল্পকলার বিরুদ্ধেও আজকের মুসলিম সমাজে মৌলবাদীদের দাপট নজর এড়ায় না। এই প্রসঙ্গে উত্থাপিত হয়েছে, 'শিখা'র সেই বিপ্লবীগণ কিভাবে প্রতিহত করেছিলেন এসব মৌলবাদীদের? তাঁরা কোন্ যুক্তিতে 'শিখা'য় শিল্পকলার পক্ষে দৃঢ় কণ্ঠে আওয়াজ তোলেছিলেন? এ প্রশ্নের উত্তরে রচিত এই প্রবন্ধ।

লোক-সঙ্গীত

আধুনিক সঙ্গীতে প্রচুর অশ্লীলতা সদম্ভে ঢুকে পড়লেও সেই প্রাচীনকাল থেকেই লোক-সঙ্গীতের একচেটিয়া বিষয়বস্তু ছিল ইতিহাস, সমাজ ও মানুষ। লোক-সঙ্গীতে অশ্লীলতার অভিযোগ রীতিমতো দুর্লভ ব্যাপার— তবুও মৌলবাদীদের ফতোয়া থামেনি। তারা একচেটিয়াভাবে মুসলমানদের জন্য সঙ্গীত হারাম ঘোষণা করে মুসলিম সমাজকে সঙ্গীত থেকে দূরে রেখেছে যুগের পর যুগ। এ ব্যাপারে 'শিখা'র প্রথম সংখ্যায় কবি আবদুল কাদির লিখেছেন: "আজকাল

অন্নচিন্তায় পল্লীর কৃষক সঙ্গীত চর্চ্চার অবকাশ করিতে পারিতেছে না। তাহার উপর সংরক্ষণশীলদের দৌরাত্ম্যে তাহাদের জীবন যেভাবে সঙ্গীত-রস হইতে বঞ্চিত হইতে চলিয়াছে, তাহাতে অতি অল্পকালের মধ্যেই বাঙ্গালী মুসলমানের সমস্ত প্রকার লোক-সঙ্গীত যে লুপ্ত হইয়া যাইবে, সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। বাংলার লোক সঙ্গীতে বাঙ্গালী মুসলমানের কি পর্য্যন্ত দান ও সৃষ্টি রহিয়াছে তাহার সীমা নির্দ্দেশ সুসাধ্য নহে। কারণ উক্ত বিষয়ের উপকরণ চাষীদের মুখে মুখে—তদ্ব্যতীত সম্মুখে সংগৃহীত উপাদান কিছুমাত্র নাই। অত্যল্পকাল পরই এই raw materialsও বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। অতীতের এই গৌরবের উপকরণসমূহ সংগ্রহ করার পক্ষে আজ পর্যন্ত মুসলমান সমাজে যথেষ্ট উদ্যম দৃষ্ট হয় নাই। ইহা একটা জাতির পক্ষে গূঢ় পরিতাপ ও দুর্নিবার লজ্জার বিষয়, বলিতে হইবে।" (বাঙলার লোক-সঙ্গীত : আবদুল কাদের, শিখা সমগ্র : মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, বাংলা একাডেমি, ২০০৩, ৫৪ পৃষ্ঠা)

এ সংখ্যাতেই কাজী মোতাহার হোসেন "সঙ্গীত-চর্চ্চায় মুসলমান" প্রবন্ধে লিখেছেন: "রসানুভূতি মানবজাতির প্রকৃতিদিও অমূল্য সম্পদ। এজন্য সৃষ্টির আদিকাল হইতে সঙ্গীত সকল দেশে, সকল জাতির মধ্যেই কোন না কোনভাবে বিদ্যমান আছে। সভ্য সমাজ হইতে অতিদূর দূরান্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের অধিবাসীদের মধ্যে একতারা বা দোতারা এবং দুই বা ততোধিক ছিদ্রবিশিষ্ট বংশীর ব্যবহার দেখা যায়। মানুষের এই স্বাভাবিক বৃত্তি যতই চাপিয়া রাখা হউক না কেন, কোন না কোন রূপে তাহার প্রকাশ অবশ্যই হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ধার্ম্মিক মুসলমানগণ প্রায় কোন সময়েই সঙ্গীতকে প্রীতির চক্ষে দেখেন না। তথাপি দেখিতে পাই, উচ্চকণ্ঠে সুললিত স্বরে আজান দেওয়া হয়, কেরাত করিয়া সুমিষ্ট স্বরে কোরাণ শরিফ পাঠ করা হয়। ইহা ছাড়া পরমার্থ সম্বন্ধীয় গজল, কাওয়ালী প্রভৃতির অন্ত নাই। মিলাদ শরিফে যে প্রকারে দরূদ পড়া হয়, এবং হজরতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য যে ওজন সমস্বরে 'সালাম আলাইকা' পড়া হয়, তাহাকে নিশ্চয়ই সঙ্গীত আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। শাস্ত্রকারেরাও আমোদে নিয়ম-নাস্তি হিসাবে বিবাহের সময় যে বাজাইয়া গান করা জায়েজ রাখিয়াছেন। ইহা হইতে অন্ততঃ এটুকু প্রমাণ হয় যে, নানারূপ সামাজিক ও ধর্ম্মনৈতিক বিধি নিষেধের ভিতরেও অনুষ্ঠানপ্রিয় মুসলমানগণের স্বাভাবিক সঙ্গীত স্পৃহা চরিতার্থ করিবার যৎসামান্য পন্থা আছে।" (সঙ্গীত-চর্চ্চায় মুসলমান : অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন, প্রাগুক্ত, ৭৮ পৃষ্ঠা)

এইরকম আধুনিক চিন্তার পর কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে অধ্যাপক সাহেব অন্য এক প্রবন্ধে রীতিমতো যুক্তি উল্লেখ করে বলেন: "ধর্ম্মের প্রকৃত ব্যাখ্যা যাই হোক না কেন, নিষ্ঠাবান মুসলমান সমাজে যে সাধারণত সঙ্গীত নিষিদ্ধ পরিগণিত, তার আর সন্দেহ কি? কিন্তু অনেক বাড়ীতে দেখতে পাই, হারমোনিয়ামের রেওয়াজ না থাকলে হয়ত গ্রামোফোনের চল আছে। আবার বাড়ীর হারমোনিয়াম টিপলে বা বাংলা গানের টান দিলে যাঁরা ধর্ম্মনষ্টের ভয়ে চণ্ডমূর্ত্তি ধারণ করেন তাঁরাই কাওয়ালী গান ও মিলাদ শরিফে উর্দ্দু ফারসী বা আরবী গজল গান শুনে আনন্দে ভাবাবিষ্ট হন। এস্থলে সঙ্গীত হালাল কি হারাম এ তর্ক মোটেই উঠে না। যদি সঙ্গীত লোকের প্রাণ স্পর্শ করে, যদি সঙ্গীতের দ্বারা জীবন ছন্দ মধুময় হয়, যদি সঙ্গীত আনন্দ, বিষাদ, ভক্তি, প্রেম প্রভৃতি ভাবের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি হয়, তবে তাকে ধর্ম্মের দোহাই রূপ কৃত্রিমতার আবরণ দিয়ে চেপে রাখা কোনক্রমেই সঙ্গত নয়। সঙ্গীত সম্বন্ধে যা বলা হ'ল চিত্র, নাট্য, কারুকার্য্য, ভাস্কর্য্য প্রভৃতি ললিত কলা

সম্বন্ধেও অল্প বিস্তর ঐ কথাই খাটে।" (ধর্ম্ম ও শিক্ষা : অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন, প্রাগুক্ত, ৫০১ পৃষ্ঠা)

চিত্র - ছবি

সঙ্গীতের চেয়ে চিত্রের প্রতি বেশি শত্রুতা মৌলবাদীদের—চিত্রের ইতিবাচক বা নেতিবাচক প্রভাব, উদ্দেশ্যকে ন্যূনতম পাত্তা না দিয়ে সোজাসাপ্টা হারাম ফতোয়া দেওয়া তাদের মজ্জাগত স্বভাব। এ-ব্যাপারেও শিখার চিন্তা রীতিমতো অবাক করার মতো! 'মোগল যুগে চিত্র-চর্চ্চা' নামক প্রবন্ধে আবদুস সালাম মুসলমানদের সাথে চিত্রকলার আদি সম্পর্কের বিষয়ে লিখেছেন: "মুসলমান শাস্ত্রে চিত্র ও ভাস্কর শিল্প-চর্চ্চা নিষিদ্ধ হইয়াছে কারণ উভয়ই পৌত্তলিকতা ও ঈশ্বরত্ব দাবী করার পক্ষে সহায়—'divinity presumption'—এ এর পরিপুষ্টি সাধন করে। শাস্ত্রের বিধানানুসারে শিল্পী ও শিল্পানুরাগী ব্যক্তিমাত্রই নরকে যাইবার পথ প্রশস্ত করিয়া লয়। ইসলাম ধর্ম্ম প্রথম প্রচারের দিনে ঘোর পৌত্তলিকতাপূর্ণ আরব দেশে এই নিষেধ বাণী ঘোষণা করা হইয়াছিল। জগতে শান্তি স্থাপনের পর মানুষের স্বাভাবিক মনোবৃত্তির ক্রমবিকাশের সঙ্গে তখনকার এই বিধির সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। কালে কালে যুগে যুগে মানব চিত্তের অদম্য উৎসাহ ও মানবাত্মার আকুল আবেদন শাস্ত্রের বাধা অতিক্রম করিয়া চিত্র ও স্থাপত্য শিল্পে পূর্ণ প্রকাশ পাইল। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে বাগদাদ শহরে যখন ইসলাম ধর্ম্মের পূর্ণ প্রতিভা বিরাজমান ছিল তখনও আব্বাস বংশীয় খলিফাগণ ইসলামের রক্ষক ও পরিপোষক হইয়াও চিত্র-চর্চ্চা করিয়াছিলেন। তাহাদের আদেশে রাজ দরবারে এ্যালবাম তৈয়ার করা হইয়াছিল। ... সব সময় সব জাতির মুসলমান অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভাস্কর শিল্প হইতে দূরে রহিয়াছিল, কিন্তু চিত্র ও স্থাপত্য শিল্পে মুসলমান উন্নতির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া জগতে বরণীয় হইয়া রহিয়াছে। জ্ঞানে মহিয়ান শক্তিমান মুসলমান সম্রাটগণই প্রথম শাস্ত্রের বিধি লঙ্ঘন করিলেন, শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ, নিগূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিয়া লইলেন। ধর্ম্ম আর মানুষের স্বাভাবিক মনোবৃত্তি উভয়কেই একত্র যুক্ত করিলেন। কলা ও শাস্ত্র যে পরস্পর বিরোধ নহে, ধর্ম্ম ও আর্ট যে বিভিন্ন গতিতে প্রবাহিত হয় না, ইহাই তাঁহারা বুঝাইয়া দিলেন।" (মোগল যুগে চিত্র-চর্চ্চা : আবদুস সালাম, প্রাগুক্ত, ১৮৭ পৃষ্ঠা)

প্রবন্ধের শেষাংশে তিনি রীতিমতো বৈপ্লবিক কণ্ঠে বললেন: "মোগলেরা নিজেদের জীবন যেভাবে সুন্দর ও শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাঁহাদের পরবর্ত্তী যুগের মুসলমানগণ সভ্য জগতে বাস করিয়া, নিজেদিগকে সভ্য বলিয়া দাবী করিয়াও তাঁহাদের মত জীবনকে সুন্দর ও শক্তিশালী করিয়া গঠন করিতে পারেন নাই। যে বিদ্যা ও শিল্পে একদিন মুসলমান জগতের দীক্ষা গুরু ছিল, আজ অজ্ঞ ও মূর্খ তথাকথিত ধর্ম্মনেতাদের স্বার্থ বিজড়িত উপদেশ অনুসারে চলিয়া সেই মুসলমান নিজেদের জীবনটাকে ব্যর্থ করিয়া তুলিয়াছে। ধর্ম্মের আদেশগুলি সময়োপযোগী ছিল। ঘোর পৌত্তলিকতার যুগে চিত্র ও ভাস্কর্য্য নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়ার সার্থকতা ছিল। ভাস্কর্য্য পৌত্তলিকতার যতটুকু সহায়, চিত্রশিল্প ততটুকু সহায় হইতে পারে না। তাই মুসলমানগণ ভাস্কর্য্য শিল্পের চর্চ্চা করিতে পারে নাই। তাহাদের মানসিক বৃত্তিগুলি চিত্রশিল্প ও স্থাপত্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। বর্ত্তমান মুসলমান ধর্ম্মের দোহাই দিয়া প্রাণের জিনিস চিত্রকে গ্রহণ করিতেছে না। বর্ত্তমান যুগে চিত্র শিল্প যে কেবল একটা ভোগের জিনিস তাহা নয়, জীবিকা নির্ব্বাহেরও যথেষ্ট উপায় বটে, একথা মুসলমান চক্ষে অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করিয়া দেখাইলেও তাহাদের চক্ষে দোজখের চিত্র ভাসিয়া উঠিবে।" (প্রাগুক্ত, ১৯৯ পৃষ্ঠা)

নাটক

যে-সময় বাঙলায় মুকুন্দ দাসের যাত্রা, নাটক হিন্দু সমাজে রীতিমতো বিপ্লব নিয়ে এসেছিল সে-সময় যাত্রা, নাটক দেখাও মুসলমানদের জন্য ছিল হারাম। এমতাবস্থায় শিখাগোষ্ঠীর অন্যতম লেখক আবদুস সালাম 'নাট্যাভিনয় ও মুসলমান সমাজ' প্রবন্ধে এমন বক্তব্য রেখেছেন যাকে অগ্রাহ্য করা কঠিন। তিনি লিখেছেন: "অভিনয়ে যে কেবল ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পতনই দেখিবে তাহা নহে, কুশিক্ষা ও কুসংস্কারের ফল, একতা, শিক্ষা ও ব্যবসায় উন্নতির মনোহর চিত্র, মানব জীবনের গূঢ় রহস্য, সৃষ্টির বৈচিত্র্য ইত্যাদি দেখিয়া সাধারণের ধারণার যে গতি হইবে, তাহাতে উহা সমাজের পক্ষে কোন অবস্থায় না জায়েজ ত নয়ই, বরং অত্যন্ত জায়েজ বলিলেও বোধ হয় অপরাধ হয় না। বরিশালের মুকুন্দ দাসের যাত্রা বাংলার বোধ হয় এমন কোন পল্লী নাই যেখানে না হইয়াছে। হিন্দু সমাজ ও সংসারের যে উপকার ও সামান্য যাত্রায় হইয়াছে তাহা বোধহয় হিন্দু সমাজের বড় বড় মনীষীদের পক্ষেও এত অল্প সময়ে করা সম্ভব হইত না। মুসলমান সমাজেও এই রকম বহু মুকুন্দের আজ বিশেষ দরকার পড়িয়াছে। অভিনয়ের ভিতর দিয়া সমাজকে তার দুর্ব্বলতা চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলে যে প্রভূত উপকার হইবে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। সমাজ সেবার পক্ষে অভিনয় বাস্তবিকই জরুরী। শিক্ষার অভাবে প্রথমথঃ সমাজে ও দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক ব্যক্তির কি হীন অবস্থা হয়, অপরপক্ষে শিক্ষার সম্মান, যশঃ সুখ ইত্যাদি অংকন করিয়া যদি অভিনয়ের ভিতর দিয়া লোক চক্ষুর সম্মুখে ধরা হয়, তাহা হইলে ফল তাহার নিশ্চয়ই সমাজের পক্ষে শুভ হয়। গ্রামের মাতব্বরের অত্যাচার, জমিদারের গোমস্তার অন্যায় উৎপীড়ন, ভাইয়ে ভাইয়ে মামলা, উকিল, মোক্তার মুহুরীর বে-আইনী আবদার অনাচারের ভয়াবহ ছবি যদি অশিক্ষিত চিন্তাহীন লোকের সম্মুখে দৃশ্যের পর দৃশ্য ঘটিত হয়, তাহা হইলেই একবারও তাহারা চোখ বুঝিয়া চিন্তা করিবার অবসর করিয়া লয় ও বোঝে। আমার মনে হয়, স্ত্রী শিক্ষার আবশ্যকতা অভিনয়ের ভিতর দিয়া বেশ হৃদয়গ্রাহী ও সুন্দর করিয়া ফুটাইয়া তোলা যায়। সমাজ নূতন করিয়া গড়িয়া তোলার পক্ষে, অভিনয়ের সাহায্য একেবারে উপেক্ষার বস্তু নহে। ইসলামের কড়া অনুশাসন সত্ত্বেও কবি ও জারির দল মুসলমান সম্প্রদায়ে এখনও বর্ত্তমান আছে। অল্প কিছু উচ্চাঙ্গের নাটক যদি এদের দিয়া গ্রামে গ্রামে অভিনীত হয়, তাহা হইলে ঐ তুচ্ছ কবি ও জারির দলও সমাজের প্রভূত উপকারে আসিবে। ধর্ম্মের অনুশাসন অভিনয়ের বিরুদ্ধে থাকিতে পারে, কিন্তু সমাজের বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য অভিনয় করা দরকার।" (নাট্যাভিনয় ও মুসলমান সমাজ : আবদুস সালাম খাঁ, প্রাগুক্ত, ১০৪-১০৮ পৃষ্ঠা)

সুস্থ শিল্পকলার বিরুদ্ধে বাঙলার মুসলমান সমাজে মৌলবাদীদের দাপট আজও অক্ষয় বিধায় শিল্পকলা এবং মুসলিম সমাজের সমন্বয়ে 'শিখা'র প্রাসঙ্গিকতা ও কার্যকারীতা স্বীকার না করে উপায় নেই। শিখাগোষ্ঠীর মতো বৈপ্লবিক দল গড়ে উঠে মৌলবাদীদের রুখে দেওয়ার জন্য তাঁদের ধ্যান-ধারণাকে অগ্রাহ্য করার সুযোগ নেই। প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি থেকে চূড়ান্ত কথাটা বলেছেন আবদুর রশিদ বি.এ.— 'আমাদের নবজাগরণ ও শরিয়ত' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন: "চিত্রাংকন, সঙ্গীত সর্ব্বত্রই যদি আমরা নিয়ম ও নীতির কেবল বাহ্যিক অনুসরণের দিকে দৃষ্টি না দিয়া তাহার প্রকৃত মর্ম্মানুযায়ী কার্য্যকরি, তাহা হইলে ধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখান হইবেই না, বরং তাহাই প্রকৃত ধার্ম্মিকতা বলিয়া গণ্য হইবে।" (আমাদের নবজাগরণ ও শরিয়ত : আবদুর রশীদ বি.এ., প্রাগুক্ত, ১০২ পৃষ্ঠা)

তথ্যসূত্র:

১. শিখা সমগ্র : মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, বাংলা একাডেমি, ২০০৩
২. মুসলিম সম্পাদিত ও প্রকাশিত বাংলা সাহিত্য পত্রিকা : ইসরাইল খান, বাংলা একাডেমি, ২০০৫

ইমাম আহমদ রেযা'র মনোবিজ্ঞান তত্ত্ব; (Psychology Theory):

আসিফ খান

মনোবিজ্ঞান হল মানসিক প্রক্রিয়া ও মানবীয় আচরণ সম্পর্কিত বিদ্যা ও অধ্যয়ন।[১] এর ইংরেজি শব্দ Psychology এর উৎপত্তি গ্রীক শব্দ Psyche তথা (আত্মা) ও Logos তথা (গবেষণা) থেকে।[২] সংক্ষেপে আত্মা সম্পর্কিত গবেষণা।

সিগমুন্ড ফ্রয়েড এর নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই। তিনি একজন অস্ট্রিয়ান নিউরোলজিস্ট ও মনোবিজ্ঞানী। তার মৃত্যু ১৯৩৯, আ'লা হযরতের ইন্তেকাল ১৯২১ সালে। ১৯৩০ সালে সিগমুন্ড কিংবদন্তী হয়ে উঠেছিলেন তার সৃজনশীল মনোবিজ্ঞানের তত্ত্ব দিয়ে।[৩] ১৯৩২ সালে ব্যক্তিত্বের উন্নতি সাধনের ধারণা দিয়েছেন। বিশেষত, সিগমুন্ড ৩টি মৌলিক সূত্র ধরে মনোবিজ্ঞানে কাজ করেছেন। এই সূত্র ধরেই তিনি ব্যক্তিত্ব গঠনের গবেষণায় সফল হয়েছেন।

সূত্র ৩টি হল ১. ID ২. Ego ৩. Superego. এগুলোর যথাক্রমে সরল অর্থ হল ১. ব্যক্তিত্বের পরিচয় ২. আত্মা ৩. অধিশাস্তা তথা মহাত্মা। আরেকটু সংজ্ঞায়িত করি। ID হল প্রবৃত্তির ইচ্ছার/ প্রয়োজনের বাস্তব পরিতৃপ্তির আনন্দ। Ego হল যা IDকে সন্তুষ্ট করার গ্রহণীয় পথ খোঁজ করে। আর Superego হল যা ID'র পারিবারিক (পিতামাতা) ও সামাজিক মূল্য নিয়ে কথা বলে। তা বিবেককেও ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত করে।[৪]

একটু কঠিন হয়ে গেল না? ইসলামি মনোবিজ্ঞান পড়লে সহজ হয়ে যাবে। যে সিগমুন্ড এ ৩টি সূত্র ধরে কাজ করেছেন, সেই ৩টি সূত্রের বর্ণনা তার প্রায় দেড় যুগ আগেই কুরআন থেকে প্রমাণ করেছেন আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা। সিগমুন্ড শুধু মনোবিজ্ঞানে জীবনের সবসময় ব্যয় করেছেন। পক্ষান্তরে আ'লা হযরত আধুনিক বিজ্ঞানের প্রায় সকল শাখায় গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব দিয়েছেন। আলা হযরতের কুরআন থেকে নেয়া ৩টি সূত্র হল ১. নফস (ID) ২. কলব (Ego) ৩. রূহ [আত্মা] (Superego)। এ তিনটিই মনোবিজ্ঞানের মৌলিক সূত্র। এ তিনটি থেকেই বিভিন্ন ঝর্ণা প্রবাহিত হয়েছে। আবার এ তিনটির সমন্বয়ে তিনি তাসাউফ তথা সুফিবাদ চর্চার নহর সৃষ্টি করেছেন। সেদিকে এখন পা দিলে পথ হারাব। অন্য সময় ব্যক্ত করব ইনশাআল্লাহ্।

নফস্ (ID) কি? সাধারণ কথায় ব্যক্তি, স্বত্তা। পবিত্র কুরআনে ৩ প্রকার নফস্ এর বর্ণনা এসেছে। ১. নফসে আম্মারাহ্[৫] তথা সবচেয়ে কুপ্রবৃত্তির নফস্, যার দ্বারা আমরা খারাপের দিকে বেশি ধাবিত হই। ২. নাফসে লাওয়ামাহ্[৬] তথা ভাল-মন্দ কাজের জন্যও অনুতপ্ত হওয়ার নফস্। অর্থাৎ ছোট পাপ করে বেশি অনুতপ্ত হওয়া এবং ভাল আমল করার পরও নিজেকে আল্লাহর কাছে কম আমলকারী ও দুর্বলরূপে প্রকাশ করা। ৩. নফসে মুতমাইন্নাহ্[৭] তথা শান্তিময়, পরিতৃপ্ত নফস্। এই নফসের ২টা পর্যায়। ১. যে ভাগ্যবান প্রশান্ত নফস লাভকারী বান্দা, যাদেরকে আল্লাহ'র নৈকট্যপ্রাপ্ত খাস বান্দাদের মাঝে প্রবেশ করতে মহান আল্লাহ আদেশ করেছেন,[৮] তাদের মাঝে প্রবেশ করা মানে তাদের কাছে গমন করা, তাদের দরবারে যাওয়া। তারা হলেন আল্লাহ'র ওলীগণ। আপনি যখন যাবেন আপনাকে

আল্লাহ’র কোন খাস বান্দা (যদি থাকে) তরিকতের অদৃশ্য আধ্যাত্মিক শিকলে আবদ্ধ করবেন। ২. দ্বিতীয় পর্যায়টি হল এখন। মানে আপনি আবদ্ধ হওয়ার পর (মৌলিক ইবাদতের পর) আল্লাহ’র যিকর্ (স্মরণ) {জলী- উঁচু স্বরে অথবা খফী- নিম্নস্বরে} এর শিক্ষা নিবেন। সেটা চর্চা করতে করতে নফসে মুতমাইন্নাহ্’র উন্নতি হয়ে কলবে মুতমাইন্নাহ্ তথা প্রশান্ত অন্তরে পৌঁছে যাবেন। এই কলবে মুতমাইন্নাহ্ সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেন, “ওই সব লোক, যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের অন্তর আল্লাহ্’র স্মরণে (যিকর্) প্রশান্তি পায়।”[৯] ঐ খাস বান্দাদের কাছে প্রবেশের আদেশ করার পর আল্লাহ্ বললেন, “এবং (প্রবেশ করে) আমার জান্নাতে এসো।”[১০]

মানে ঐ খাস বান্দার যদি খাস মুরীদ হয়ে যান, তাহলে তাঁর সদর (বক্ষ) দেখে আল্লাহ’র পথ পেয়ে যাবেন। এখানেই ফানা, বাকা। এটা অনেক উঁচু পর্যায়। এটার জন্য ভাগ্য, সাধনা, সময় ও উপযুক্ত যুগ প্রয়োজন। বর্তমান সময়ে আপনি তরিকতের মধ্যে সাধারণ ইরাদায় যেতে পারেন। অর্থাৎ বায়আতে বরকতের মাধ্যমে শিকলাবদ্ধ হয়ে সৎপথে চলতে থাকবেন, দীনের কাজ করতে থাকবেন। আপনি না প্রবেশ করেন, নো ম্যাটার্। কিন্তু বিরোধীতা করবেন না, হিংসুক হবেন না, নিজেকে বেশি সৎ ভাববেন না। ভাল কাজে মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করুন, ফেতনা সৃষ্টি করবেন না। এ পথই সত্যের-শান্তির, ইসলামের বিজয়ের, এ পথ ধরেই খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতি (র.) ও হযরত শাহাজালাল (র.) সহ সুফিরা ভারতীয় উপমহাদেশে সফর করে ইসলামের বিজয় পতাকা উড়িয়েছেন। এটাকে কখনো ভুলে যাবেন না। এ পথ মিথ্যে নয়। না বুঝলে গভীর সাধনা করে বুঝে নিবেন। আমরা যেটাকে তরিকত বলি সেটাকে পাশ্চাত্যের লোকেরা Sufi-Order বলে। আমরা যাদের পীর বলি তাদেরকে মধ্যপ্রাচ্য ও আরবের লোকেরা ‘শায়খ’ বলে থাকে।

সকল ভণ্ডামির বিরুদ্ধেই আমাদের অবস্থান। ভুল সবকিছুতেই থাকে, সবার থাকে। শোধরিয়ে দিন, সংস্কার করুন, পরামর্শ দিন। তবুও বিরোধীতা নয়। মনে রাখবেন আবু জাহেল সত্যের পথে চেষ্টা না করে বিরোধীতা করতে করতে আবুল হিকাম থেকে আবু জাহেল হয়েছে! নফস্ এখানেই শেষ। মনোবিজ্ঞান ফেলে অনেক দূর চলে এলাম, না? হ্যাঁ, আত্মার উন্নতিটাই মনোবিজ্ঞান। পরবর্তীতে কলব (Ego) ও রূহ (Superego) নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে মনোবিজ্ঞান শেষ করব, ইনশাআল্লাহ্।

তথ্যসূত্র:

১. Psychology, Wikipedia.
২. প্রাগুক্ত
৩. সিগমুন্ড ফ্রয়েড, অবদান অংশ, উইকিপিডিয়া।
৪. Dr. Muhammad Maalik, Scientific Work Of Imam Ahmad Raza, Page-12.
৫. ১২ (সুরা ইউসুফ) : ৫৩
৬. ৭৫ (সুরা কিয়ামাহ্) : ০২
৭. ৮৯ (সুরা ফাজর্) : ২৭
৮. ৮৯ (সুরা ফাজর্) : ২৯
৯. ১৩ (সুরা রা’দ) : ২৮
১০. ৮৯ (সুরা ফাজর্) : ৩০

লেখক- শিক্ষার্থী, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

তাঁর অবির্ভাব

রাঈস আল জুহালা

পৃথিবীর সবকিছুই সুনির্দিষ্ট নিয়মে চলে। যেমন চলে চাঁদ। ত্রিশদিনের একটি দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয় তাকে। নিয়মানুযায়ী শেষের পনেরো দিন চাঁদ আলোহীন এবং প্রথম পনের দিন চাঁদ আলোকিত। আবার তাঁর মধ্যে তিন দিন পর্যন্ত চাঁদ দেখতে হয় অপরূপ, পূর্ণ দীপ্তিময়। মানবসভ্যতাও অনেকটা এমনই। মানবসভ্যতাতেও বিদ্যমান এই কৃষ্ণপক্ষ ও শুক্লাপক্ষ। ইসলাম ধর্মে মানবসভ্যতার কৃষ্ণপক্ষের এই সময়টাকে বলা হয়- আইয়্যামে জাহেলিয়া বা বর্বরতার যুগ। আরব দুনিয়ায় এই বর্বরতার যুগ শুরু হয় ইসা আলাইহিস সালাম'র আড়াল হওয়ার পর থেকেই। কিন্তু, এই অমাবস্যাতো স্থায়ী নয়। একদিন তা কেটেই যায়। ঠিক আরব সভ্যতার অমাবস্যাও কেটে যাওয়ার আভাস মিলল। চাঁদ উদিত হওয়ার নিদর্শন মিলতে লাগল। হঠাৎ একদিন, দীর্ঘ অন্ধকার, বর্বরতা এবং কুসংস্কারাচ্ছন সভ্যতায় আলোর দিশারির ঘটল অবির্ভাব। এ যেন ঘোর অমাবস্যার পর পূর্ণিমার আভাস। ৬৭০ খ্রিস্টাব্দের ১২ রবিউল আউয়াল সোমবার সুবহে সাদেকের সময় হযরত আমেনা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার ঘরে অবির্ভাব ঘটলো পূর্ণিমা ছড়ানো দাগহীন এক পূর্ণ চাঁদের। আলোকিত হয়ে উঠল হযরত আমেনা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার ঘর। সব্যসাচী লেখক আব্দুল মান্নান সৈয়দ বলেন,

"দ্বাদশ রজনী - সোমবার - রবিউল আওয়াল
বক্ষে তাঁকে পেয়ে হলো হর্ষে মত্ত, উদ্দাম, উত্তাল।
সোমবার – রবিউল আওয়াল – দ্বাদশ রজনী
ধন্য হলো বক্ষে পেয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রত্নমণি।
রবিউল আওয়াল – দ্বাদশ রজনী – সোমবার
সালামে – চুম্বনে তাঁকে রোমাঞ্চিত নিজেই বারবার।"[১]

অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার থেকে গোটা মানবসভ্যতার আলোর দিশারি আজ পৃথিবীতে পদার্পণ করলেন। বিশ্বমানবাতার মূক্তির দূত পদার্পণ করলেন। প্রথমবারের মত পদার্পণ করলেন, দুনিয়া সৃষ্টির একমাত্র কারণ, রসুলে কায়েনাত, হাবিবে খোদা, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মোল্লা আলী ক্বারী হানাফি রাহিমাহুমুল্লাহ এই চিত্রপটকে কল্পনা করেই বলেছেন, "তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছিলেন বসন্তকাল। যাঁর আগমনে সৃষ্টি হয়েছে নব বসন্তের জোয়ার। জাগতিক বসন্তের চেয়ে তিনি ছিলেন লাখ-কোটি গুণ অধিক আলো দানকারী নূর।"[২] ঠিক একই কথাই আলা হযরত রহিমাহুমুল্লাহ বলছেন,

"ওহ সুয়ে লালাহ যার ফিরতে হে
তেরে দিন আয় বাহার ফিরতে হে।"
অর্থ- সে (দ.) আসে সাথে বাতাসে বসন্ত ফিরে
ফাগুনের উদ্বোধনের দিগন্ত জুড়ে।

কুরআনুল করিমে আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করছেন, "তাদেরকে আইয়্যামুল্লাহ (আল্লাহ'র দিবসসমূহ) স্মরণ করিয়ে দাও "[৩] ক্বামূস-এর মধ্যে রয়েছে যে, 'আইয়্যামুল্লাহ' দ্বারা 'আল্লাহ'র অনুগ্রহরাজির কথাই বুঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস, উবাই ইবনে কা'ব, হযরত মুজাহিদ এবং ক্বাতাদাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম 'আইয়্যামুল্লাহ'-এর

ব্যাখ্যা 'আল্লাহ'র অনুগ্রহসমূহ' দ্বারা করেছেন (তাফসিরে খাযিন, মাদারিক ও ইমাম রাগিব কৃত মুফরাদাত)।[৪] আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর প্রেরিত সর্বোত্তম অনুগ্রহ সম্বন্ধে জানিয়ে মুমিনদেরকে ইরশাদ করছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ্ মুমিন বান্দাদের উপর এক বিরাট অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের মধ্য থেকে তাদের কল্যাণের জন্য একজন রসুল প্রেরণ করেছেন।"[৫] এমন মহান নেয়ামত পেলে আমরা কী করবো? সেই করণীয় সম্বন্ধেও আল্লাহ্ তায়ালা জানাচ্ছেন, "আল্লাহর অনুগ্রহ ও তারই দয়া, সেটার উপর তাদের আনন্দ প্রকাশ করা উচিত। তা তাদের সমস্ত ধন-দৌলত অপেক্ষা শ্রেয়।"[৬] আল্লাহর আদেশ মোতাবেক আমাদেকে তাঁর অনুগ্রহসমূহ স্মরণ করতে হবে, নেয়ামত প্রাপ্তিতে শুকরিয়া আদায় এবং আনন্দ উদযাপন করতে হবে। করতে হবে এই কারণে যে, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলে আল্লাহ্ তায়ালা তা বৃদ্ধি করে দেন। আর অস্বীকার করলে রয়েছে কঠিন আযাব।[৭]

মক্কার মরুময় অঞ্চলে ৬৭০ খ্রিষ্টাব্দের ১২ রবিউল আউয়াল সোমবার সুবহে সাদেকের সময় হযরত আমেনা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার ঘর আলোকিতা সেই নূরের রশনিতে দুনিয়ার পূর্ব পশ্চিম আলোকিত হয়ে উঠেছে। মুক্তি পেয়েছে মানবতা। প্রধান্য পেয়েছে মানবিকতা। নজরুল বলেন,

"তাপীর বন্ধু, পাপীর ত্রাতা,
ভয়-ভীত পীড়িতের শরণ-দাতা,
মূকের ভাষা নিরাশের আশা,
ব্যথার শান্তি, সান্ত্বনা শোকে
এল কে ভোরের আলোকে।"

তথ্যসূত্র:

১। বাংলা কাব্যে নবী-বন্দনা এবং নজরুলের মুনশিয়ানা : আবু সাইদ নয়ন, বইসই প্রকাশনী, ২০২০, ১২৫ পৃষ্ঠা

২. ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.)'র তাৎপর্য : অধ্যাপক সৈয়দ মুহাম্মদ কামাল উদ্দীন হায়দার, মাসিক তরজুমান, রবিউল আউয়াল, ১৪২৬ হিজরী সংখ্যা।

৩. সুরা ইব্রাহিম : ৫

৪. সুরা ইব্রাহিম ৫ নং আয়াতের তফসির। তফসিরে খাযায়েনুল ইরফান, সাদরুল আফাযিল, নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী (রহ.), বঙ্গানুবাদ- মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান।

৫. সুরা আলে ইমরান : ১৬৪

৬. সুরা ইউনুস : ৫৮

৭. সুরা ইব্রাহিম : ৭

রহস্যের ব্যবচ্ছেদ অথবা হিরণ্ময় নীরবতা

জুবায়ের ইবনে কামাল

বুক রিভিউ বলতে আজকাল যেসব রিভিউ দেখা যায় আমি তার ঘোরবিরোধী। আমি আসলে সেই 'তথাকথিত' রিভিউতে বিশ্বাসী নই বরং আমি মনে করি প্রত্যেকটা বইয়ের গদ্যের ধরণ থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা ছোট বিষয়েরও আলাদা বিশেষত্ব আছে।

আমি যখন কিনেছিলাম তখন বইটির নাম ছিলো 'নিছক গল্প কিংবা আখ্যান'। এই নামটার মাহাত্ম্য নিয়ে পরে কথা বলছি। তার আগে বলি বইটি লিখেছেন মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন। যারা বাংলাদেশী মৌলিক থ্রিলার ঘরানার বই পড়েন এবং বাংলা থ্রিলার নিয়ে খোঁজ-খবর রাখেন তারা হয়তো অনেকে তাঁর নাম শোনে থাকবেন। বলা যায় তিনি কোলকাতা ও ঢাকায় সমান জনপ্রিয়। তার লেখা বিখ্যাত ট্রিলজি 'রবীন্দ্রনাথ এখানে কখনও খেতে আসেননি' ইতোমধ্যে দুই বাংলায় সাড়া ফেলে দিয়েছে। বাংলা ভাষার ওটিপি প্ল্যাটফর্ম হইচই ইতোমধ্যে এই ট্রিলজির প্রথম বই নিয়ে ওয়েব সিরিজ তৈরীর ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি ২০০৫ সালে নিজে একটি প্রকাশনী খোলেন যার নাম দেন 'বাতিঘর প্রকাশনী'। তার এখন পর্যন্ত দশের অধিক বই বেরিয়েছে। বলাবাহুল্য তার একটি বাদে সবই জমাট থ্রিলার। বাকী একটি বই নিয়েই আজকের কথাবার্তার বিষয়।

নিছক গল্প কিংবা আখ্যান বইটি বের হয় ২০১৯ সালে। তার কিছুদিন পর ভিন্ন নামে কোলকাতার অভিযান পাবলিশার্স থেকে একই বই বেরোয়। তারও কিছুদিন পর পরিবর্তিত নাম দিয়েই বইটির নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হতে শুরু করে। আমি বেশ আগ্রহী ছিলাম বইটার প্রতি এজন্য যে, তাঁর থ্রিলারের বাইরের গল্প আদৌ কেমন! খুলে বুঝলাম এটা একটা গল্পগ্রন্থ। হাতে গুনে দেখলাম গল্পের সংখ্যা আঠারো ছুঁয়ে গেছে। কিছু গল্প নিয়ে কয়েক লাইন লেখার লোভ সামলাতে পারছি না।

বইটির দ্বিতীয় গল্পটির নাম 'লেখকের আসন'। বলা যায় থ্রিলারেরই একটি সাব-জনরা। বেশীরভাগ দার্শনিকরা পৃথিবীর সবকিছুকেই চক্রে আবদ্ধ করে তাদের দর্শন-চিন্তা প্রকাশ করেছেন। সক্রেটিস থেকে ফুকো সবার ক্ষেত্রেই। আপনারা খেয়াল করলে দেখবেন, ছোটবেলা থেকেই আমরা আসলে চক্রের বিভিন্ন আকৃতি পড়েই বড় হই। যেমন ধরুন খাদ্যচক্র। অথবা ধরা যাক বাস্তুসংস্থান। একটু বড় হয়ে যারা বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করি তারা তো পরমাণু মডেলের ভুল-শুদ্ধ খুঁজতে গিয়ে নিজেরাই এক কঠিন চক্রে পরে যাই। অন্যান্য গ্রুপের শিক্ষার্থীরাও তাদের প্রত্যেক বিষয়ে বড় এক চক্রের খোঁজ পান। আমরা অবচেতন মনে তা লক্ষ্য করি না। আপনি সকালে বের হচ্ছেন, ঘুরছেন, খাচ্ছেন, ফিরে আসছেন এই অসম চক্রের গতিশীলতা কখনোই আপনি বুঝবেন না। কিন্তু আপনি ঠিকই চক্রের একটা অংশমাত্র। আমার মনে হয় এই গল্পটা সেরকমই এক ভয়ংকর চক্রের ইঙ্গিত দেয়। আর বেশি কিছু বলার তেমন প্রয়োজন নেই।

উপরে যেই গল্প নিয়ে বললাম সেটি বইটির দ্বিতীয় গল্প তা আগেই বলেছি। প্রথম গল্পের নাম 'ছিট ফিরোজের বিবাহ

সংক্রান্ত জটিলতার উপাখ্যান'। সত্যি বলতে এই গল্পটার নাম ততটাই জটিল মূল গল্পটি আসলে ততটাই সাদামাটা। আমি বুঝতেই পারিনি আসলে এখানে 'গল্পটা' কী! **কিন্তু আপনি এরকম একটা গল্প পড়ে বিরক্ত হয়ে যখন দ্বিতীয় গল্পটা পড়ে মৃদু ধাক্কা খাবেন** তখন আপনি নড়েচড়ে বসতে বাধ্য। গল্পগ্রন্থ লেখার সময় কোন গল্প আগে বসবে আর কোনটা পরে বসবে এটা নিয়ে লেখকেরা পাজল করেন। এর অনেকগুলো বিখ্যাত ও কার্যকর পদ্ধতি আছে। এই বইটিতে প্রবলভাবে এই বিষয়টার উপস্থিতি দেখা যায়।

যেমন আরেকটা উদাহরণ দেয়া যাক। আপনি যখন যথাক্রমে সাদামাটা ও মৃদু ধাক্কা মার্কা গল্প পড়ে আশাবাদী হয়ে পরের গল্প পড়বেন তখনই লেখক আপনাকে পড়ের গল্পে নিয়ে যাবে যার নাম 'যে কারণে লাশ ভেসে উঠতে পারে'। নামেই মৃদুভাবে থ্রিলারের গন্ধ আছে। আদতেও তাই। পরবর্তী প্রায় গল্প তিনেক আপনাকে থ্রিলারের বৈচিত্র্যময় গল্প পড়তে হবে। তবে একঘেয়েমি লাগার আগেই আবার একটি ফুলটস ডেলিভারি দেয়া হবে। 'পিথিকোফেবিয়া কিংবা অন্দরে বান্দর' সেরকমই একটি গল্প। জনরায় ফেলতে গেলে বড়জোর এটাকে ফ্যান্টাসিতে ফেলা যায়। সফট থ্রিলার থাকায় ফ্যান্টাসি থ্রিলার বললে খুব বেশী অপরাধ হবে না। কিন্তু আপনি আগের গল্পের ধারা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন।

এতক্ষণ এসব পড়ে আপনি কি একটা জিনিস খেয়াল করেছেন? এই বইয়ের গল্পের নামগুলো বেশ অন্যরকম। তা নাহলে আবার গল্পের নামগুলো পড়ুন। আরো কয়েকটা নাম বলতে পারি। যেমন-

- রহস্যের ব্যবচ্ছেদ অথবা হিরন্ময় নীরবতা
- সুন্দরবনে যেভাবে শূয়রের দল জায়গা করে নিলো

এই বইয়ের আরেকটি দিক হলো বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী যা আমরা সায়েন্স ফিকশন নামে চিনি। নিছক একটি ট্যুরিং টেস্ট সেরকমই একটি গল্প। গতানুগতিক সায়েন্স ফিকশনগুলোতে কিছু হাবিজাবি জিনিস দিয়ে খিচুড়ি তৈরী করা হয়। এগুলোকে হাবিজাবি বলি কারণ আমি নিজে প্রচুর সায়েন্স ফিকশন পড়েছি এবং অবাক হয়ে লক্ষ্য করেছি কেউ কেউ ঘুরে ফিরে একই কনসেপ্টের উপর গল্প ফাঁদে বৈ আর তেমন কিছুই করে না। যেমন সায়েন্স ফিকশনের সবচেয়ে সস্তা একটি পয়েন্ট হলো পৃথিবীর বাইরে চলে যাওয়া। **অথবা কোন এলিয়েন আসা। এগুলো এখন বর্ণমালা বইয়ের স্বরে-অ পড়ার মত পানসে লাগে। কিন্তু এই বইতে প্রত্যেকটা সাই-ফাই গল্পে বেশ বৈচিত্র্যতা লক্ষ্য করা যায়। শেষ থার্টিফার্স্ট নামের অন্য একটি গল্পে পৃথিবীর বাইরের এলিয়েন নিয়ে এলেও শেষে বুঝতে পারবেন আসলে আমাদের প্রযুক্তির উৎকর্ষতার কল্পদিক নিয়েই এর মূল আলোচনা।**

এই বইয়ের সবচেয়ে অসাধারণ দিকটি হলো গল্পগুলোর নিজস্ব ছন্দ থাকা। অনেক সময়ই গল্পের ভেতরের বর্ণনা

সহজে পাঠকের হাতে ছেড়ে দেয়া হয়। এতে পাঠক বুঝতে পারে এর পরের লাইন কী হতে চলেছে। এটা আমার কাছে বিরক্তিকর। আমি এখানে এর উল্টোটা পেয়েছি। একটা মুক্তিযুদ্ধের গল্প আছে এখানে যার নাম 'মেকানিক'। সেখানে দেখা যায় মৃত্যুশয্যায় শায়িত বাবুল নামের একজনের প্রাথমিক জীবনের সাদামাটা গল্প। যে কিনা বাবার অনুপস্থিতিতে ধোলাইখালের একটি গ্যারেজে কাজ নেয়। তখন সে চোখে সানগ্লাস পরা গ্যারেজের মালিক 'আবু ওস্তাদ'কে দেখে অবাক হয়। কারণ সে গাড়ির তাবৎ কাজ জানতো। হঠাৎ শুরু হয় দেশে যুদ্ধ। পাকিস্তানি মিলটারিরা গাড়ি ঠিক করাতে আসে আবু ওস্তাদের কাছে। দেশে তখন তুমুল রক্তক্ষয় হচ্ছে। ভয়ে ভয়ে বাবুল তার হতদরিদ্রতা নিয়ে গ্যারেজের কোনায় বেঁচে থাকে। আর আবু ওস্তাদ মিলিটারিদের সাহায্য করে, গাড়ি ঠিক করে দেয়। হঠাৎ একদিন তার ওস্তাদ পালিয়ে যায়। কারণ জানা যায়, তার ওস্তাদ আসলে গাড়ি ঠিক করার বদলে পাক-শত্রুদের গাড়িগুলো বিগড়ে দিয়েছে। সেগুলো ব্রেকফেল হয়েছে অজায়গায়। আবু ওস্তাদ এখন সাক্ষাত মৃত্যুর অপেক্ষায়।

পুরো গল্পজুড়ে বাবুলের এরকম মর্মস্পর্শীতার বর্ণনা পেয়ে গেলেও গল্প শেষে আপনি বুঝতে পারবেন আসলে গল্পটা বাবুলের না। গল্পটা সেই মেকানিক আবু ওস্তাদের। যিনি ১৬ই ডিসেম্বর দেশ বিজয়ের পর একদিন হঠাৎ করে পুরান ঢাকার গলি কাঁপিয়ে তার একটি পুরনো বাইক নিয়ে ভটভট আওয়াজ করে গ্যারেজে ফেরেন। তার চোখে সানগ্লাস। আসল নায়কের বেশে। এই দৃশ্য আপনাকে মৃত্যশয্যায় থাকা সেই বাবুলের গল্প ভুলিয়ে দেবে।

বইটির প্রথম সংস্করণ। নাম ছিলো 'নিছক গল্প কিংবা আখ্যান।

পরবর্তীতে নাম পরিবর্তন করে নতুন সংস্করণ বের হয়।

কালোত্তীর্ণ

বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য

বিশ্ববিদ্যালয়ের মত সংস্থাসমূহের সাফল্যের মূল্যমান নির্ধারণের জন্য স্নাতক ও পূর্বস্নাতকদের সংখ্যা গণনা যথেষ্ট নয় ; কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র কিছু বাস্তব ও গতিহীন শিক্ষা প্রদান নয়। অপরপক্ষে সায়েন্স ও হিউমেনাইটিসের ক্ষেত্রে জ্ঞানকে অবশ্যই পরিবর্তনশীল, উন্নয়নমুখী ও ক্রমবর্ধমান হতে হবে। অতএব বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য ছাত্রদের মাথায় কতগুলি ঘটনা ও সংখ্যা ঢুকিয়ে দেওয়া নয়, বরং ছাত্রদের মধ্যে সৃষ্টিধর্মী চিন্তাধারার সৃষ্টি করা। তার দৃষ্টি তার বিবেচনাকে পরিপক্ক করা এবং তার চিন্তাকে স্বাধীন করে তোলা। যদি কোন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের জন্য সৃষ্টিধর্মী ও বিশ্লেষণমুখী চিন্তার দ্বার খুলে দিতে সক্ষম হয় তাহলে বলতে হবে যে সেই বিশ্ববিদ্যালয় উপযুক্ত ছাত্র ও নাগরিক সৃষ্টির কাজে সাফল্য অর্জন করেছে।

মুহম্মদ সিদ্দিক খান রচনাবলী : মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪, ৩৮৩ পৃষ্ঠা

আক্রমণের সহজ পন্থা

প্রতিক্রিয়াশীল শব্দটিও অত্যন্ত সরবে রাজনৈতিক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে এবং এখনো ব্যবহৃত হচ্ছে। যার লেখা পছন্দ করি না, তাকে আক্রমণ করার সহজ পন্থা হচ্ছে 'প্রতিক্রিয়াশীল ' বলা । আমাদের দেশের তথাকথিত কিছু কিছু বুদ্ধিজীবী এই শব্দটি যত্রতত্র ব্যবহার করেন এবং নিজেদের মস্তিষ্কশূন্যতা প্রমাণ করেন। এরিস্টটলের চিন্তাধারা, মত সবকিছুই তো প্রতিক্রিয়া। এই প্রতিক্রিয়া না থাকলে সাহিত্য সৃষ্টিই অসম্ভব। ফুল দেখি এবং আনন্দিত হই। এটা এক ধরনের প্রতিক্রিয়া, অন্যায় দেখি এবং ক্ষুব্ধ হই এবং এটাও এক ধরনের প্রতিক্রিয়া; যুবতী দেখি এবং কামনায় জর্জরিত হই— এটা তো প্রতিক্রিয়া, পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে তা তো প্রতিক্রিয়া রূপেই ঘটে। যারা প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য এ শব্দটি বারবার ব্যবহার করেন আসলে তাদের এই প্রয়োগ বিধিটাই প্রতিক্রিয়াশীল।

সৈয়দ আলী আহসান মনীষার মুখ: আবদুল হাই শিকদার সম্পাদিত, ঝিঙেফুল প্রকাশনী, ২০০৩, ৮২ পৃষ্ঠা

কালোত্তীর্ণ

ভোট পাওয়া রাজনীতি

বাংলাদেশে এখন বড় দুই দলের রাজনীতি হচ্ছে ভোট পাওয়া রাজনীতি। কোনো প্রকারে ক্ষমতায় যাওয়ার রাজনীতি। ক্ষমতায় এই যাওয়া-আসার সঙ্গে জনগণের কোনো সম্পর্ক নেই। এদল-ওদল ক্ষমতায় যাবে-আসবে, কিন্তু জনগণের মুক্তির যে আকাঙ্ক্ষা ছিল সেটা সফল হবে না। অর্থনৈতিক মুক্তির প্রশ্নকে তারা প্রধান করে তুলছেন না। একজন অপরজনকে ইতর ভাষায় গালাগালি করছেন। কে ভোট চোর, কে চুরি বেশী করে, কে কম করে, কে হরতাল করে ইত্যাদি বক্তব্যই প্রধান। তারা মানুষের সমস্যাগুলো নিয়ে ভাবেন না। অভাবটা নেতৃত্বের। আমাদের দেশে যে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার মূল কাজ নেতৃত্ব দেয়া নয়, কর্তৃত্ব করা। নিজেদের, দলীয় বড়জোর শ্রেণীস্বার্থই এরা দেখে।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী নির্বাচিত সাক্ষাৎকার: ইমরান মাহফুজ সম্পাদিত, ২০২০, ২০ পৃষ্ঠা
(*প্রথম আলো*, ১৩ ডিসেম্বর, ১৯৯৮)

শ্রদ্ধা ও স্মরণ

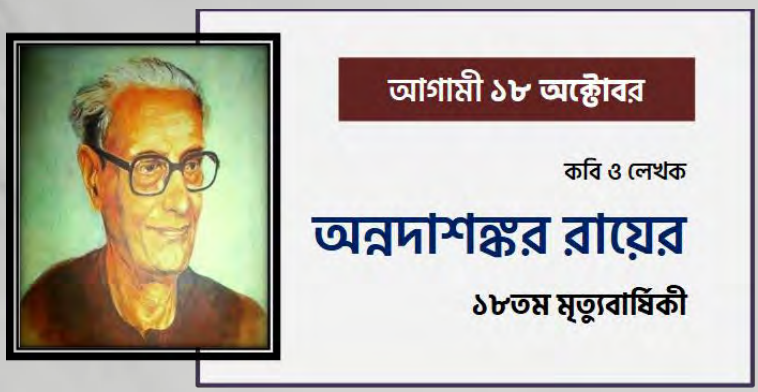

আগামী ১৮ অক্টোবর

কবি ও লেখক

অন্নদাশঙ্কর রায়ের

১৮তম মৃত্যুবার্ষিকী

উত্তম দাস:

১. অন্নদাশঙ্কর রায়ই প্রথম তাঁর পত্রজাতীয় রচনাগুলিকে প্রবন্ধের আকার দেন। কেননা, ইতিপূর্বে অনেকেই অনেক পত্র-সাহিত্য রচনা করেছেন। যেমন রবীন্দ্রনাথের *ছিন্নপত্রাবলী*। কিন্তু সেগুলি প্রবন্ধের আওতায় আসে না। কারণ, সেখানে যুক্তি-তর্ক, তত্ত্ব ও তথ্য এবং কোনো বিষয়কে কেন্দ্র করে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার প্রয়াস নেই। কিন্তু অন্নদাশঙ্কর রায়ের বেশ কিছু পত্রজাতীয় প্রবন্ধ রয়েছে, যেগুলিতে তত্ত্ব, তথ্য ও কোনো বিষয়কে কেন্দ্র করে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার কথা রয়েছে।

২. অন্নদাশঙ্কর রায় সংস্কৃতি চিন্তায় বারবার ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতাকে মেলাতে চেষ্টা করেছেন। লোকসংস্কৃতির উপর যে আমাদের পরিবর্তমান সংস্কৃতি দাঁড়িয়ে আছে কিংবা ঐক্যবদ্ধ লোকসাহিত্য যে আধুনিক সাহিত্যের উৎসভূমি— তা একাধিক প্রবন্ধে তিনি যুক্তিসহ দেখিয়েছেন।

৩. বিভিন্ন মনীষীর দ্বারা তিনিই শুধু আলোকিত হননি, সেই আলোয় তাঁদেরও আলোকিত করেছেন। প্রাবন্ধিকের গুরুত্ব এখানেই যে, তাঁর মতো আর কোন বাঙালি লেখক দেশি ও বিদেশী, সমসাময়িক বা চিরকালীন এত বেশি সংখ্যক ব্যক্তিকে নিয়ে প্রবন্ধ লেখেননি।

৪. অন্নদাশঙ্কর রায় বহুমুখী সাধনার সমন্বয়ে বিশ্বাসী। একদিকে তিনি সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক অন্যদিকে মানবিক ও নৈতিক দায়বদ্ধতার প্রাবন্ধিক। একাধারে রস তথা সৌন্দর্যের সাধক এবং বিবেক তথা সত্যের সৈনিক। ফলে তাঁর প্রবন্ধগুলি শুধু সাহিত্যের জন্য লেখা হয়ে উঠেনি, বরং তার সামাজিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব যথেষ্ট। বাঙালীকে জাগ্রত করার মন্ত্র তাঁর প্রবন্ধগুলি।

অন্নদাশঙ্কর রায়ের প্রবন্ধ : বিষয়-বৈচিত্র্য ও ভাবনার ভিন্ন মাত্রা, উত্তম দাস, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ, ২০১৭ (উক্ত পিএইচডি অভিসন্দর্ভ থেকে নেওয়া)

> “গান্ধীজি বলতেন ‘আমার জীবনই আমার বাণী’। আমি বলি, আমার বাণীই আমার জীবন। আমার বাণীর মধ্যেই আমার জীবন নিহিত।”
>
> প্রবন্ধ সমগ্র : অন্নদাশঙ্কর রায়,
> মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৪১৩, ১৬৬ পৃষ্ঠা

শ্রদ্ধা ও স্মরণ

আবদুল মান্নান সৈয়দ:

অগ্রজ মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও সমসাময়িক বিষ্ণু দের সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথও চিন্তাশীল কবি। বিষ্ণু দে'র সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের তফাৎ হচ্ছে বিষ্ণু দে মননের মুখোশ এঁটে রোমান্টিকতারই চর্চা করেছেন—সেদিক থেকে তিনি জীবনানন্দেরই সহযাত্রী। কিন্তু মাইকেল ও সুধীন্দ্রনাথ অনেকখানি নিয়মাবদ্ধ। আবেগে এঁরা দুজন কখনোই একেবারে ভেসে যান না। এঁদের প্রতিটি শব্দ ও বাক্য চিন্তাকে বহন করে। আর এই চিন্তাবাহী কবিতাই মাইকেল ও সুধীন্দ্রনাথকে করে তুলেছে নিয়তি-তাড়িত—বিষ্ণু দে'র অন্তরালশায়ী রোমান্টিকতা মুক্তি দিয়েছে তাঁকে। বিষ্ণু দে তার শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলোতে প্রকৃতির কাছ থেকে সান্ত্বনা শুশ্রূষা পেয়েছেন ; মাইকেল বা সুধীন্দ্রনাথ তা পাননি। মানুষই এঁদের কবিতার একমাত্র বিষয়- মানুষের অভিযাত্রিকতা আর তার ভেঙে পড়া। সুধীন্দ্রনাথের *দশমী*র 'অগ্রহায়ণ' কবিতায় তাই ঋতুর বন্দনা নেই, আছে ব্যক্তিজীবনের নিষ্ফলতার বিবরণ। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মধ্যে কবি অরুণকুমার সরকার যে-মহাকাব্যিক আততি দেখেছিলেন সামগ্রিকভাবে তা মাইকেলের সঙ্গেই তুলনীয়—যদিও মাইকেলের অবলম্বন ছিল মহাকাব্য, সুধীন্দ্রনাথের গীতিকবিতা।

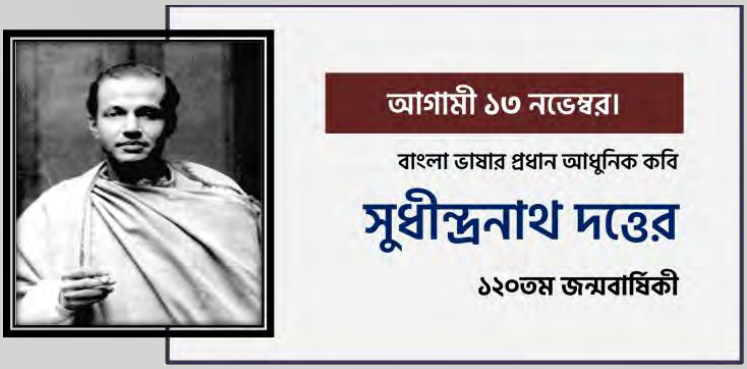

আধুনিক প্রধান বাঙালি কবিদের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ দত্তই সবচেয়ে কম কবিতা লিখেছেন। কিন্তু ঐ অল্প কবিতার মধ্যে বিষয়ে যেমন তেম্নি ছন্দপ্রকরণেও তিনি একটি নতুন মাত্রা যোজনা করেছিলেন। প্রশাসিত ও পরীক্ষামূলক তাঁর ছন্দ তাঁর বক্তব্যের সমান্তরালে বাংলা কবিতাকেই একটি নতুন দিগন্ত দেখিয়েছে।

একুশের স্মারকগ্রন্থ ২০০২ : বাংলা একাডেমি, ২০০৭, ১৫ ও ২৬ পৃষ্ঠা

কমরুদ্দিন আহমদ:

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বিশ শতকের একজন শ্রেষ্ঠ বাঙালি। ইংরেজি 'genius' শব্দে অলৌকিকের যে-আভাস আছে, তা স্বীকার্য হলে প্রতিভা এক ধরনের আবেশ। সংস্কৃত 'প্রতিভা' শব্দের আক্ষরিক অর্থ অনুসারে তা হবে বুদ্ধিদীপ্ত মেধার নামান্তর। বাংলা কাব্যে সুধীন্দ্রনাথ সেই বুদ্ধিদীপ্ত মেধা। অথচ প্রতিভার প্রাচুর্য নিয়ে সুধীন দত্ত গভীর নিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন কবিতা রচনার কর্মযজ্ঞে। তিনি ছিলেন বহু ভাষাবিদ, পণ্ডিত ও মনস্বী, তীব্র বিশ্লেষণী বুদ্ধির অধিকারী, তত্ত্বে আসক্ত, দর্শনে ও সংলগ্ন শাস্ত্রসমূহে বিদ্বান। তাঁর পঠনের পরিধি ছিল বিরাট – এবং বোধের ক্ষিপ্রতা বুদ্ধির সীমা অতিক্রান্ত ও অসামান্য। তাঁর কাণ্ডজ্ঞান, সাংসারিক ও সামাজিক সুবুদ্ধি, আলাপদক্ষ, রসিক, প্রখর ব্যক্তিত্বশালী পরিপূর্ণ মনীষা – সবকিছুই হয়েছে কবিত্বের অনুষঙ্গ।

কমরুদ্দিন আহমদ: কালি ও কলম (অনলাইন)

শ্রদ্ধা ও স্মরণ

শামসুজ্জামান খান:

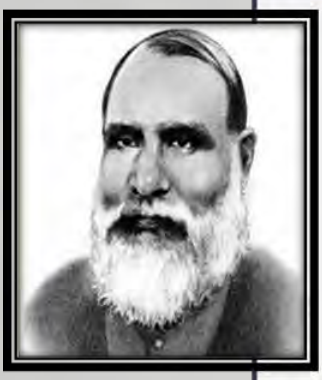

মীর মশাররফ হোসেনের জীবন ও সাহিত্য বিশাল ও নানা বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। তাঁর চরিত্রে জটিলতা আছে, আছে কিছু

রহস্যময়তা, তবে সামগ্রিকভাবে তার চিন্তা-চেতনা প্রগতিশীল, সম্মুখমুখী ও যুক্তিনিষ্ঠ। ভারতবর্ষের তৎকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তাঁর সাহিত্য ও চিন্তাধারাকে স্থাপন করেই তার সামগ্রিকতাকে বোঝা সম্ভব। ...। সমাজের নানা বিকৃতি, ভেদ-বিভেদ এবং অনুদারতার মধ্যে একজন মহৎ লেখক এবং চিন্তাশীল মনীষী হিসেবেই তিনি তাঁর সামাজিক ও সৃষ্টিশীলতার দায় ও দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি আমাদের মহৎ ও উজ্জ্বল উত্তরাধিকারের একজন প্রবল পুরুষ ও মৌলিক স্রষ্টাই শুধু নন, একালেও তার চিন্তা-চেতনা আমাদের নানাভাবে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করতে পারে।

একুশের স্মারকগ্রন্থ '৯৬: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৬, ১৬৬ পৃষ্ঠা

বশীর আল হেলাল:

'বিষাদ-সিন্ধু' উপন্যাসে মীর মশাররফ হোসেন বিদ্যাসাগর, মাইকেল আর বঙ্কিম থেকে প্রবাহিত করে এক অনবদ্য বাংলা গদ্যের স্মৃতি এবং অভ্যাস আমাদের মধ্যে চারিয়ে দিয়ে গেছেন। এ-উপন্যাসে ভাবের উচ্ছ্বাস আর কল্পনা বড় বেশি, এর প্লটও শিথিল, ইমাম হাসান, হোসেন, জয়নাবের মতো চরিত্রগুলিকে তিনি গড়ে তুলতে পারেননি। কিন্তু অসাম্প্রদায়িক ও অসাধারণ মানবীয় গুণে ভরা এ উপন্যাস। ট্রাজেডির নায়ক ইমাম হোসেন তাঁর সেই নিয়তির অমোঘ টানে শেষ যুদ্ধে যাওয়ার আগে বলে যাচ্ছেন, তোমরা আর যুদ্ধ করো না। কিন্তু শান্তির এই বাণীকে নিয়ে মীর মশাররফ প্রচার-কাব্য রচনা করেন নি, এমনকি বঙ্কিমচন্দ্র যুতটুকু করেছেন ততটুকুও নয়, এইখানে এর মাহাত্ম্য।

তাঁদের সৃষ্টির পথ: বশীর আলহেলাল, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩, ৬-৭ পৃষ্ঠা

আবদুল মান্নান সৈয়দ:

মীর মশাররফ হোসেন এক অসাধারণ লেখক। ঊনবিংশ শতাব্দীতে সারা বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র আর রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে মীর মশাররফ হোসেনের তুল্য বড়ো লেখক আর নেই। তাঁর কালোত্তর গ্রন্থ বিষাদ-সিন্ধু বাদেও গাজী মিয়ার বস্তানী, আত্মজৈবনিক রচনাসমূহ, কবিতা, নাটক, পত্রিকা সম্পাদনা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে মীরের সব্যসাচী প্রতিভা বিকশিত হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে মুসলমান: আবদুল মান্নান সৈয়দ,
ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১৮, ২২ পৃষ্ঠা

শ্রদ্ধা ও স্মরণ

আগামী ৮ নভেম্বর।

মননশীল সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর

১২৪তম জন্মবার্ষিকী

মুজীবুর রহমান খাঁ:

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী একজন উঁচু স্তরের মননধর্মী সাহিত্যিক ছিলেন। রচনাশিল্পের ওপর তাঁর দখল ছিল অপরিসীম। তাঁকে আমরা বলতে পারি, আমাদের গদ্যের শাহাদাৎ হোসেন। ভাষার যে নিপুণ মুনশীয়ানা ও সুষ্ঠুতা কবি শাহাদাৎ হোসেনের কবিতায় আমরা পাই, তারই কতকটা যেন আমরা সফল হয়ে উঠতে দেখেছি মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর গদ্যরচনায়। শব্দ চয়ন ও প্রয়োগে তাঁর শিল্পীমনের পাহারা তাঁর রচনায় সর্বত্রই অতন্দ্র থাকত।

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী: মুজীবুর রহমান খাঁ, মোহাম্মদী, কার্তিক, ১৩৬১

আবদুল মান্নান সৈয়দ:

ভাষা, সাহিত্য, সমাজ, রাজনীতি, শিক্ষা, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে রচিত তার সংখ্যাহীন প্রবন্ধ সদাসর্বদা সুচিন্তিত, সুলিখিত এবং প্রাগ্রসর চিন্তায় সমৃদ্ধ। মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী অবিরাম ভেবেছেন, অবিরাম লিখেছেন। নিজের লেখার পরিশোধন বা পুনর্লেখনের অভ্যাস বা অবকাশ ছিলো না তাঁর। কিন্তু তাঁর চিন্তার ধারাবাহিকতা অনুসরণের জন্যে রয়েছে একই বিষয়ে রচিত তাঁর পরম্পরীণ প্রবন্ধসমূহ। মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর ভাবনা-বেদনা কোনো একটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ ছিলো না। সার্বিক ও সামগ্রিক এষণাই ছিলো তাঁর। ফলে তাঁর ভাষা, সাহিত্য, সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম বিষয়ক ভাবনা-চেতনা পরম্পরের মধ্যে প্রবিষ্ট। বৃহৎ চলিষ্ণু সমাজের পটে সবসময় তাঁর প্রবন্ধগুলি স্থাপিত। হিন্দু-

মুসলিম মিলনের ভাবনা তাঁর সমকালীন কাজী নজরুল ইসলাম ও কাজী আবদুল ওদুদের মতো তাঁরও চিন্তার একটি কেন্দ্রকোরক। কিন্তু একই সঙ্গে তাঁর সমস্ত ভাবনা-বেদনা উৎসারিত হয়েছে বাঙালি-মুসলমানের বিষয়পরিধি থেকে। তবে কখনোই কোনোরকম অন্ধতা সেখানে আমরা দেখি না। বিশের দশকে বাঙালি-মুসলমানের জাগরণের যে বিশাল বিকাশ ঘটেছিলো, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর সার্বভৌম গ্রহণশীলতা ও প্রজ্ঞাপ্রোজ্জ্বল অবলোকন সেখানে বিশিষ্ট ভূমিকা উদযাপন করেছে।

সম্ভবত তাঁর কালে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীই সর্বতোভাবে ঐতিহ্য ও পূর্বজদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। অগ্রজদের মতামতকে তিনি সব সময়ই গুরুত্ব দিয়েছেন; কিন্তু এও সত্য, কোনো কিছুই তিনি নির্বিচারে গ্রহণ করেননি। এই অন্ধতামুক্ত বলেই তিনি সমকালীন প্রতিভাবান সহকর্মীদের প্রতিও সমান শ্রদ্ধাশীল। কাজী নজরুল ইসলামকে যে শ্রদ্ধা তিনি দেখিয়েছেন, তা বিস্ময়কর। নজরুলের সমকালীন একজন লেখক হয়েও নজরুলকে যে নিরাসক্ত দৃষ্টিতে তিনি বিচার করে তাঁর মহিমা কীর্তন করেছেন। তাতে স্পষ্ট হয়, তার একটি সর্বদর্শিতা ছিলো। পূর্বজদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেও তিনি যতোখানি সমকালীন হয়ে উঠেছেন, তা এক নজরুল ছাড়া তাঁর সমকালে আর কেউ অর্জন করতে পারেননি। ভাষা, সাহিত্য, সমাজ, রাজনীতি, প্রশাসন, শিক্ষা, নর-নারীর সম্বন্ধ, ধর্ম ইত্যাদি অজস্র বিষয়ে তিনি অজস্র প্রবন্ধ রচনা করেছেন। যথার্থ ভাবুক বলেই তার চিন্তা কখনো থেমে যায়নি—ফলে ৪০ বছর ধরেই যিনি লিখেছেন স্বভাবতই তাঁর মতামত কিছু কিছু পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু সব সময়ই তাঁর লক্ষ্য ছিলো বাঙালি মুসলমানের উন্নয়ন-জাগরণ-সন্দীপন।

> “
>
> ওয়াজেদ আলী ছিলেন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধীরস্থির ও গোছানো চিন্তাবিদ। তিনি যেমন গোছাইয়া সাজাইয়া লিখিতে ও বলিতে পারিতেন, চিন্তাও করিতেন তেমনি গোছালোভাবে।
>
> ”
>
> **আবুল মনসুর আহমদ**
>
> ওয়াজেদ আলী সম্বন্ধে দু-চার কথা : আবুল মনসুর আহমদ, সওগাত, অগ্রহায়ন, ১৩৬১

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী রচনাবলী তৃতীয় খণ্ড: আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি, ২০১৩, ভূমিকা থেকে উৎকীর্ণ

মহররম সংখ্যা

ডাউনলোড

সফর সংখ্যা

ডাউনলোড

ফেসবুক গ্রুপ

সওগাতের ফেসবুক গ্রুপে যুক্ত হয়ে আপনিও হয়ে যান সওগাত পরিবারের একজন।

https://www.facebook.com/groups/sowgat

বিজ্ঞপ্তি

সওগাত রবিউস সানি সংখ্যায় যারা লিখতে চান তারা গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ বা ভ্রমণ কাহিনী লিখে ১৩ নভেম্বরের মধ্যে ই-মেইল করুন নিচের ঠিকানায়:

sawgat.ms@gmail.com

“আমরা তিনটি উপায়ে প্রজ্ঞা লাভ করি: প্রথমত, গভীর চিন্তা বা অনুধ্যানের মাধ্যমে যেটা মহত্তম উপায়; দ্বিতীয় যে উপায়ে প্রজ্ঞা লাভ করি সেটা হলো অনুকরণ, যেটা সহজতম; আর তৃতীয় উপায় হচ্ছে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে, যেটা সবচেয়ে তেতোময়”

_____কনফুসিয়াস